রক্তে ভেজা গারো পাহাড়

রক্তে ভেজা
গারো পাহাড়

শিশির রাজন

বেহুলাবাংলা

রক্তে ভেজা গারো পাহাড়
ইতিহাস-গবেষণা
শিশির রাজন

দ্বিতীয় পরিমার্জিত মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশন
বেহুলাবাংলা
৬১ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫
এবং
৩৮ বাংলাবাজার, ৩য় তলা, ঢাকা ১১০০।
01682270721, behulabangla2015@gmail.com
www.behulabangla.com

পরিবেশক : রকমারি ডটকম

মুদ্রণ : রেডিয়্যান্ট, বাবুপুরা, নিউ মার্কেট, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ : আল নোমান

মূল্য ২০০ টাকা
US $ 12

Rakte Veja Garo Pahar
by Shishir Rajan
A Publication of Behulabangla; 2nd Edition: February 2019
61 Concord Emporium Shoping Complex
253-54 Elephant Road, Katabon, Dhaka 1205.
And
38 Banglabazar, 2nd floor, Dhaka 1100.

ISBN : 978-984-94165-2-4

উৎসর্গ

প্রদীপ দত্ত মজুমদার
নূপুর দত্ত মজুমদার
আমার বাবা-মা
এবং
টংক আন্দোলনের বীর শহিদদের প্রতি।

দ্বিতীয় মুদ্রণের কথা

বইটি ২০১৩ সালে অমর একুশে বইমেলায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকের চাহিদার কারণে এবার দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। আশাকরি, বইটি পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠক টংক আন্দোলনের বীরত্বগাথা সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারবেন।

সব সহযোগীর প্রতি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ প্রকাশক কবি চন্দন চৌধুরী দাদার কাছে, যিনি যত্নসহকারে বইটি প্রকাশ করেছেন। ছবি তুলে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন আলোকচিত্রী মেসবাহ্ সুমন ভাই।

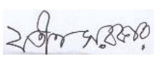
শিশির রাজন
৮ ডিসেম্বর ২০১৮
নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।

ভূমিকা

প্রথমেই বলে নিই, শিশির রাজনের এই বইটি পাঠ করে আমি চমৎকৃত হয়ে গেছি। সে এখনো কলেজের ছাত্র। কলেজে তার পাঠ্যবিষয় প্রাণিবিদ্যা। কিন্তু সে এই বইটিতে টংক আন্দোলনের যে স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছে, তাতে তো তাকে সমাজবিজ্ঞানের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বলে মনে হয়। শুধু মেধাবী নয়, অসাধারণ তার পর্যবেক্ষণ শক্তি। যেসব এলাকায় টংক আন্দোলন চলেছিল, সেসব এলাকায় নিজে গিয়ে এ আন্দোলনটির স্বরূপ সন্ধানে বস্তুনিষ্ঠ অনুশীলন করেছে। হাজংদের বাড়ি বাড়ি গিয়েছে। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলে টংক আন্দোলনের ঐতিহ্যটি যথাযথভাবে অনুধাবন করেছে। সেই সঙ্গে তার পঠনের পরিধিও অনেক বিস্তৃত। যেখানে যে বইয়ে এই আন্দোলন সম্পর্কে সামান্য কথাও পাওয়া যায়, সেসব বইয়ের প্রায় সবই সে পড়েছে। শুধু পড়েনি, সব তথ্যেরই সবিচার-বিশ্লেষণ করেছে। টংক প্রথাটি যে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ নামক প্রথাটিরই উপজাত, এ বিষয়টি বুঝতে সে একটুও ভুল করেনি। কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহই তো প্রকৃত প্রস্তাবে টংক আন্দোলনের স্থপতি। মণি সিংহের ‘জীবনসংগ্রাম’ বইটি রাজন খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়েছে, এবং সে লেখা থেকে যথাযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ করে নিয়েছে। সে রকমই নিয়েছে খোকা রায়ের ‘সংগ্রামের তিন দশক’ প্রমথ গুপ্তের ‘যে সংগ্রামের শেষ নেই’, খালেকদাদ চৌধুরীর ‘শতাব্দীর দুই দিগন্ত’ এবং মৌলবী আব্দুল হান্নানের ‘আমার জীবনে কমিউনিস্ট পার্টি’ থেকে। মৌলবী আব্দুল হান্নানের বইটির সঙ্গে খুব কম পাঠকই পরিচিত। সে বইটি এখন পাওয়াও যায় না। অথচ সে বইয়ে মৌলবী সাহেব টংক তথা নয়া সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে নিজের সংগ্রামের সংযুক্তির যেসব বিষয় উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন, সেসব অন্য কোনো বইয়ে বা লেখায় কেউই দেখাতে পারেননি। এগুলোর বাইরে অন্য অনেক বইয়েও টংক আন্দোলনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নানাভাবে উঠে এসেছে। সেগুলোর প্রায় সবই শিশির রাজন তার লেখায় তুলে এনেছে। বইয়ের শেষ অংশে রাজন দুটো তালিকা সংযোজন করেছে। একটি ‘টংক আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছেন’, অন্যটি ‘আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছেন’। এ রকম

তালিকা প্রস্তুত করা অবশ্যই কষ্টসাধ্য। রাজন যাদের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছে, তাদের বাইরেও হয়তো অনেক শহিদ অংশগ্রহণকারী রয়ে গেছেন। তবু এ ক্ষেত্রে রাজনের কৃতিকে কোনো মতেই ছোট করে দেখা যাবে না। শহিদ এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁদের সম্পর্কে বেশি তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে, তাঁদের বিষয়ে সে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করেছে। অন্যদের কেবল নাম উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ রাজন তার লেখায় সর্বত্রই বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় রেখেছে, কোথাও সামান্য ফাঁকিবাজির প্রশ্রয় দেয়নি। আরো বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় শিশির রাজন অবশ্যই আরো কৃতির পরিচয় দেবে। গবেষকরূপে তাঁর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

রাজনের বইটি পড়ে যে কোনো পাঠকই টংক আন্দোলন সম্পর্কে যথাযথ অবহিতি লাভ করবেন এবং অনেক ভাবনার খোরাক পাবেন। আমি রাজনকে প্রাণভরা স্নেহাশিস জানাই।



১৩ জানুয়ারি ২০১৩
'বানপ্রস্থ'
নেত্রকোনা।

প্রথম মুদ্রণে লেখকের কথা

বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য। সুদূর অতীত থেকেই এ অঞ্চলের অধিকারবঞ্চিত কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়েছেন। শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে জীবন উৎসর্গ করেছেন। কৃষকদের এ আন্দোলনগুলো তখনই সফল হয়েছে, যখন আন্দোলনের সাথে মিশেছে রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ব। টংক আন্দোলনও এমনি একটি আন্দোলন, যেখানে সমন্বয় ঘটেছে আদিবাসী হাজং কৃষকদের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ব। ব্রিটিশ শোষকদের সময় এ আন্দোলন শুরু হয়ে সশস্ত্র রূপ লাভ করেছিল পাক সরকারের আমলে। এ সশস্ত্র সংগ্রাম পাক শাসকদের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। সঠিক নেতৃত্ব পেলে সাধারণ কৃষকরাও শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, নিজেদের মুক্ত করতে পারে, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত টংক আন্দোলন। মূলত টংক আন্দোলনেই ছিল বাংলাদেশের পরবর্তী সময়ের কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎস। পাক সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে কৃষকদের সার্বিক মুক্তির প্রচেষ্টা সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল আমাদের ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য যে, আজ পর্যন্ত এ আন্দোলন রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। যে হাজং কৃষকরা এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তাদের সব কিছু হারিয়েছিল, যাদের অধিকাংশই হয়েছিল বিতাড়িত। বর্তমানে সেই হাজং সম্প্রদায় বাংলাদেশে কোনোভাবে টিকে আছে মাত্র। সেদিকে রাষ্ট্রের নেই কোনো খেয়াল। এমনকি এ আন্দোলন নিয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও বাংলাদেশে রচিত হয়নি। যার দরুন অনেক কিছুই আমাদের অগোচরে থেকে গেছে। কিছু ইতিহাস হয়েছে বিকৃত। হয়েছে টানাহেঁচড়া। এ আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নিয়ে বাংলাদেশে এই প্রথম কোনো স্বতন্ত্র বই রচনা করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে টংক আন্দোলনে শহিদ হাজংমাতা রাশিমণি হাজংকে নিয়ে ফিচার লেখার জন্য দুর্গাপুরের বহেরাতলী গ্রামে যাই। এই সময়েই কমরেড মণি সিংহ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন টংক

আন্দোলনে কৃষকদের রক্তক্ষয়ী বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে, এ আন্দোলনে হাজং কৃষকদের যে মর্মস্পর্শী বীরত্বগাথা আখ্যান রচিত হয়েছিল, তা জানার আগ্রহ থেকেই এই বইয়ের যাত্রা শুরু। আমি এ বইয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিহাসকে স্বচ্ছভাবে তুলে আনার চেষ্টা করেছি। তবু অনেক তথ্যের ঘাটতি থাকতে পারে। পাঠকের এই সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য-উপাত্ত জানা থাকলে, আশা করি তা অবগত করে সহযোগিতা করবেন। যাতে ভবিষ্যতে তা যুক্ত করতে পারি।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার প্রিয় দু'জন মানুষ–অধ্যাপক যতীন সরকার স্যার ও কবি সরোজ মোস্তফা স্যারের কাছে। যাদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় এই দুরূহ কাজটি আমার পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্বপন হাজংসহ মাঠ পর্যায়ে যারা আমাকে মূল্যবান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। যাদের বিস্তারিত তালিকা বইয়ের শেষ দিকে দেওয়া আছে।

এ ছাড়া আন্দোলনের মূল্যবান বই, তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্নভাবে যারা আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তারা হলেন–অধ্যাপক কামরুজ্জামান চৌধুরী, লেখক জালাল উদ্দিন আহমেদ, যুগল কিশোর কোচ, সঞ্জয় সরকার, সুমন নংমিন, মহুয়া হাজং, মো. শাজাহান মিয়া, কবি আবুল কাইয়ুম আহম্মদ, কবি আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ খায়রুল হক, মো. আলমগীর, কবি লোকান্ত শাওন, দীপক সরকার, আশীষ দত্ত, রাজীব দাস, কাঞ্চন বিন, নাসরিন আক্তার, রূপা সরকার, দেবজ্যোতি রায়, ফকির আলমগীর প্রিন্স, ভূইয়া মাহাবুব আলম, প্রেমাংশ মজুমদার পার্থ, চম্পা সরকার, সুফিয়ান, মিথুন রায়, পুলক পাল, রামপ্রসাদসহ আরো অনেকে। যাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ মামা মিলন রায়, দাদা বিশ্বজিৎ দত্ত মজুমদার, আবাহন মজুমদার, জামাইবাবু কবি মানস গুণ, দিদি দিপীকা দত্ত মজুমদার, লিপিকা দত্ত মজুমদার, অয়ন দত্ত মজুমদার ও সায়ান্ত রায়সহ আমার পরিবারের সদস্যদের কাছে। যারা সব সময়ই আমাকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। বইটি যত্নসহকারে প্রকাশের জন্য প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ।

শিশির রাজন
৬ জানুয়ারি ২০১৩
দক্ষিণ সাতপাই, নেত্রকোনা।

ক্র ম

প্রথম পর্যায়ে টংক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ১৭
টংক আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ২০
দ্বিতীয় পর্যায়ে টংক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ২২
টংক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় ২৪
তৃতীয় পর্যায়ে টংক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ৩১
টংক আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় ৩৪
হাজং অঞ্চলে সরকারের বর্বরতা ৪৮
আন্দোলনের কিছু বিতর্কিত বিষয় পর্যালোচনা ৫১
টংক আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন ৫৭
আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন ৬৩

১৮৮৫ সালে বাংলার কৃষকদের সুবিধার জন্য 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' পাস করা হয়। কিন্তু কার্যত এটি ছিল কৃষকদের ধোঁকা দেওয়ার প্রয়াস। এই আইনের দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে জমিদাররা কৃষকদের শোষণ করতে থাকে সামন্তবাদী প্রক্রিয়ায়। প্রজাস্বত্ব আইনের দুর্বলতা থেকেই সৃষ্টি হয় 'টংক' প্রথায় ভূমি ব্যবস্থার। ১৯৩৭-৫০ সাল পর্যন্ত তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার সুসং দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দী থানায় (সে সময়কার নেত্রকোনা মহ্কুমার উত্তরাঞ্চল ও জামালপুর মহ্কুমার কিয়দংশ) 'টংক' প্রথার বিরুদ্ধে তিনটি পর্যায়ে চলে আন্দোলন। শেষ পর্যায়ে আন্দোলনটি রূপ নেয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। আন্দোলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল আদিবাসী হাজং কৃষকরা। এটি ছিল হাজংদের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক শক্তির সমন্বয়। মূল কথা, এই আন্দোলনের মাধ্যমেই হাজংরা জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়। টংক আন্দোলন পরিচালনার সাংগঠনিক নেতৃত্বে ছিলেন মণি সিংহ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার মাসফ্রন্ট 'কৃষক সমিতি'। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হাজং কৃষক ও অন্য কৃষকদের উদ্দেশ্য ছিল এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। অন্যদিকে আন্দোলনরত কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনরত অঞ্চলে তাদের ক্ষমতার স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং এর মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পথ প্রসারিত করা।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের গারো পাহাড় অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরনো। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ অঞ্চলে করম শাহ্ নামের এক লোক 'পাগল পন্থা' নামক একটি মতবাদ প্রচার করেন। এ মতবাদে জমিতে সব কৃষকের সমান অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়। করম শাহের মৃত্যুর পর তার শিষ্য সুসং পরগনার লেটিরকান্দা গ্রামের টিপু পাগলার নেতৃত্বে কৃষকরা জমিদারদের পরাজিত করে শেরপুর শহরে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে কৃষকের কোনো খাজনা দিতে হতো না।

পাগলপন্থীদের আন্দোলনের ঐতিহ্যের একটি প্রভাব পড়ে গারো পাহাড় অঞ্চলে হাজংদের হাতিখেদা আন্দোলনে এবং এর ধারাবাহিকতায় হাজংদের সংগ্রামের ঐতিহ্যের ব্যাপকতা দেখা যায় টংক আন্দোলনে।

টংক আন্দোলনে হাজং কৃষকদের সংগ্রামের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে

অধ্যাপক যতীন সরকার লিখেছেন–

"... ... বিশ শতকের নানকার বিদ্রোহ, টঙ্কবিরোধী আন্দোলন বা তেভাগার লড়াইয়ের মতো প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলোর ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতা গ্রহণ করেছে লৌকিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি থেকেই। লৌকিক ঐতিহ্যের সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও দৃঢ়মূল সাম্য-চেতনা না থাকলে কমিউনিস্ট নেতৃত্বেও এমন জঙ্গি আন্দোলন গড়ে উঠতে পারত না।

এখানে আরো একটি বিষয় গুরুত্বসহ বিবেচ্য। টঙ্কবিরোধী বা তেভাগা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে কৃষকরা যোগ দিয়েছিল, তাদের সংখ্যাগুরু অংশই ছিল হাজং বা সাঁওতালের মতো বাংলার 'আদিবাসী' সম্প্রদায়ের লোক। এই 'আদিবাসী'দের মধ্যে স্মরণাতীতকালের কৌম ঐতিহ্যভিত্তিক সাম্যচেতনা অনেক বেশি জীবন্ত বলেই বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদীদের কৃষকের অধিকার-সম্পর্কীয় বক্তব্যও এদের মধ্যেই (অন্তত মিশনারিদের পাল্লায় পড়ে যারা স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেনি, তাদের মধ্যে) অতি সহজে সাড়া জাগাতে পারে। তুলনায় অনেক কম সাড়া জাগে বাঙালির কৃষককুলের সেই অংশে, যেটি অধিক পরিমাণে শ্রেণিসংস্কৃতি প্রভাবিত। শোষক শ্রেণির সংস্কৃতির প্রভাব তাদের নানাভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে বলেই সাম্প্রদায়িক প্রচারণাও তাদের কখনো কখনো বিভ্রান্তির ঘূর্ণিপাকে ঠেলে দেয়।"

(বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য, পৃ. ১৫৫)

অন্যদিকে, সে সময়ে আদিবাসী হাজংদের সমাজকাঠামো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের সমাজব্যবস্থায় আদিম কৃষিজীবী সংঘবদ্ধ উৎপাদন প্রচলিত ছিল। তাঁরা আদিম সাম্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একসাথে কৃষিকাজ, মাছধরা, পশু পালন করত। তাদের উৎপাদন সবটাই ছিল প্রকৃতিনির্ভর এবং তাদের মূল শক্তি ছিল পেশিশক্তি। সংঘবদ্ধ এই হাজং জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজ সম্প্রদায়ের একে অপরের প্রতি মমত্ববোধ অপেক্ষাকৃত বেশি পরিলক্ষিত হয়। এমনকি একে অন্যকে বাঁচানোর জন্য মৃত্যুকে পর্যন্ত পরোয়া করেন না। যার দৃষ্টান্ত হাজংদের হাতিখেদা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে টংক আন্দোলনে দেখা যায়।

ঠিক কোথা হতে হাজংরা বাংলাদেশে আগমন করেছে, তার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অনেকেই মনে করেন, হাজংরা তিব্বত থেকে এ অঞ্চলে এসেছেন। আবার অনেক পণ্ডিত মনে করেন, হাজংরা আসামের গৌহাটি অঞ্চল থেকে এসেছেন।[১] যাইহোক, জীবন ও জীবিকার

তাগিদে হাজংরা গারো পাহাড় অঞ্চলে আসেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, কঠোর পরিশ্রমী ও সাহসী এ আদিবাসীদের ১৭৭০ সালে সুসং জমিদার গারো পাহাড় অঞ্চলে বসবাসের অনুমতি দেন। কিন্তু এই ঠাঁই দেওয়ার পেছনে জমিদারদের উদ্দেশ্য ছিল হাজংদের সস্তা শ্রম কেড়ে নেওয়া এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা। এ ইচ্ছা অনুযায়ী জমিদাররা হাজংদের দিয়ে হাতি ধরার কাজ করাত। এ জন্য হাজংরা জমিদারদের কিছু নিষ্কর ভূমি চাষাবাদের সুযোগ পেত। হাতি ধরার কাজে হাজংরা ছিল খুবই পারদর্শী। তাঁরা গৃহপালিত কুনকী হাতি দিয়ে বন্য হাতি ধরত। যা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। জীবনের প্রয়োজনেই তাঁরা এই দুঃসাহসী কাজকে সহজভাবে মেনে নিয়েছিলেন। এমনকি জমিদারকে তাঁরা দেবতুল্য মনে করত। হাজংদের ধৃত হাতিগুলো জমিদাররা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন–মুর্শিদাবাদ, আগ্রা, দিল্লি ইত্যাদি জায়গায় বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। এমনকি তাঁরা মুঘল সম্রাটকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য হাতি উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করত। হাতি ধরার কাজ ছিল হাজংদের বেগার খাটার নামান্তর। তাদের লাভের অংশ ছিল শূন্য। বন্য হাতি ধরতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারালো বহু হাজং শ্রমিক। ফলে প্রাণের ভয়ে অনেক হাজংই হাতি ধরার কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায় সুসং জমিদার হাজংদের খেদার কাজ বাধ্যতামূলক করে দেন। তাদের বাড়িঘর ছেড়ে হাতি ধরতে বাধ্য করা হয়। যদি কেউ তার অন্যথা করত, তবে জমিদার তাদের ওপর চালাতেন অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু হাজংরা এ রকম পরিস্থিতি মেনে নিতে পারেননি। মনা সর্দারের নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তারা হাতি খেদার কাজে একেবারেই অস্বীকৃতি জানায়। এর শাস্তিস্বরূপ বর্বর জমিদার মনা সর্দারকে হাতির পায়ে পিশে হত্যা করে। এতে হাজংরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে হাতি খেদার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গারোরাও তাদের আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে। জমিদারদের বিরুদ্ধে হাজংরা কেবলই প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। আন্দোলন জঙ্গি আকার ধারণ করে। তারা দুর্গাপুরের বারোমারি ময়দানে জমিদার বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হাজং মাহুতেরা তাদের হাতিগুলো ছেড়ে দেন। এতে জমিদার বাহিনীর অনেকেই হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা যান। জমিদার নেত্রকোনায় পালিয়ে এসে আত্মরক্ষা করেন। বিদ্রোহী হাজংরা ফারাংপাড়া, চেংনী, ধেনকী, বিজয়পুর, ভরতপুর, আড়াপাড়া প্রভৃতি জায়গায় হাতি ধরার খেদাগুলো ধ্বংস করে ফেলেন। বিভিন্ন জায়গায় হাজংদের সাথে জমিদার বাহিনীর রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়। কিন্তু জমিদার বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের সামনে হাজংরা টিকতে পারেননি। ফলে অনেকেই গ্রেপ্তার হন।

এদের মধ্যে গ্রেপ্তারকৃত গোড়া চাঁদ হাজংয়ের খোঁজ আর পাওয়া যায়নি। সোয়া হাজং, রতি হাজং, মংলা হাজং, বেহারি হাজং, বাঘা হাজং, জগা, হাজং, হাতি খেদা আন্দোলনে এমন অসংখ্য বীরের রক্তে ভিজেছে গারো পাহাড়ের মাটি। এর পরও আন্দোলন পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৮৭৯ সালে সরকার হাতি খেদা আইন প্রণয়ন করে। সুসং মহারাজ সরকারের কিছু শর্ত মেনে ১৮৮০ সাল পযন্ত খেদার কাজ করেছিল।

শর্তগুলো হলো–

১. সোমেশ্বরীর পূর্বপার হতে খাসিয়া হিল পর্যন্ত মহারাজ বাহাদুরের খেদার স্থল নির্দিষ্ট থাকবে। তবে খেদাসংক্রান্ত কোনো বাহানাতেই সোমেশ্বরী পার হয়ে খেদা করতে পারবে না অথবা তথা হতে হাতি তাড়িয়ে আনতে পারবে না।

২. পাট্টার মেয়াদ ৩রা জানুয়ারি হতে ১৫ মার্চ প্রবল থাকবে।

৩. ধৃত হাতিগুলো নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে বণ্টিত হবে।

৪. (ক) 'ছ' ফুটের ন্যূন ও আট ফুটের ঊর্ধ্বে যেসব হাতি ধৃত হবে, তা মহারাজেরই থাকবে, তাতে গভর্নমেন্টের কোনো স্বত্ব থাকবে না।

(খ) 'ছ' ফুটের ন্যূন ও আট ফুট পর্যন্ত দু'ভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগ মহারাজ পাবেন, অন্য ভাগ গভর্নমেন্টেকে দিতে হবে। গভর্নমেন্ট ইচ্ছে করলে মহারাজের অর্ধাংশের সমুদয় কি কতক হাতি (প্রত্যেক) ফি ফুট ১০০ টাকা মূল্য অবধারণ করে ক্রয় করতে পারবে।

(গ) বেজোড় হাতি থাকলে তা গভর্নমেন্ট নেবে।

(ঘ) অংশ মনোনীতের ভারও গভর্নমেন্টের হাতে ন্যস্ত থাকবে ইত্যাদি।[২]

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেসব হাজং শ্রমিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাতি ধরার কাজ করবে, তাদের অধিকার বা ক্ষতিপূরণের বিষয়টি সরকার বা জমিদার উভয় পক্ষই তাচ্ছিল্যের সাথে এড়িয়ে গেছে। চুক্তিতে কোথাও তাদের কথা বলা হয়নি। বিষয়টি হাজংদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। সরকার ১৮৮৪ সালের ১৯ মে সুসং মহারাজের কাছ থেকে খেদা তৈরির সব ক্ষমতা তুলে নেয়।[৩]

প্রথম পর্যায়ে টংক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

সরকার হাতি খেদার ক্ষমতা সুসং জমিদারদের হাত থেকে তুলে নিলে তাদের অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে তারা জমির খাজনা আদায়ের দিকে মনোনিবেশ করে। প্রচলন করে টংক প্রথার। 'টংক' একটি দেশি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে ধান কড়ারির খাজনা। এ প্রথায় জমিতে কৃষকের কোনো অধিকার নেই। জমিদার কোনো কৃষককে জমি দিলে তার খাজনা দিতে হতো জমিতে উৎপন্ন ফসলে। যার হার নির্ধারণ করতো জমিদার নিজেই। সামন্তবাদী[৪] উৎপাদনব্যবস্থায় জমিদার উৎপাদকের ওপর চালাতো অতিরিক্ত জবরদস্তি। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে পাঁচটি থানা সুসং দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দীতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সে সময় এসব এলাকায় জমিদারদের কাছ থেকে জোত জমির বন্দোবস্ত নিতে হলে কৃষককে সোয়া একরে একশত টাকা থেকে দুইশত টাকা নজরানা দিতে হতো। অন্যদিকে টংক প্রথায় জমি গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষকদের কোনো নাজরানা লাগতো না। সে জন্য দরিদ্র হাজং কৃষকদের টংক প্রথায় জমি গ্রহণ ছিল সহজ। ফলে হাজং কৃষকরা টংক প্রথার জমি গ্রহণ শুরু করেন। এ সময় সুসং পরগনায় টংক প্রথা ছিল সবচেয়ে কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হতো ৭-১৫ মণ। অথচ সে সময়ে জোত জমির খাজনা ছিল এক একরে পাঁচ-সাত টাকা। প্রতি মণ ধানের দাম ছিল সোয়া দুই টাকা। ফলে হিসাবে দেখা যায়, এগার থেকে সতের টাকা টংক কৃষকদের বেশি দিতে হতো। পরবর্তীকালে গারো পাহাড়ের সমতলে বসবাসরত মুসলমান কৃষকরাও টংক প্রথায় জমি গ্রহণ শুরু করেন। টংক প্রথায় জমি গ্রহণ যখন কৃষকদের মাঝে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করলো, তখন প্রতিবছর নিলামে টংকের হার নির্ধারণ করা হতো। ফলে প্রতিবছরই টংকের হার বাড়তে থাকলো। কখনো কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ–অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পোকামাকড়, বন্য জন্তুর আক্রমণ প্রভৃতি কারণে ফসলের ক্ষতি হলেও বা অনির্ধারিত কোনো কারণে জমি চাষ না করলেও কৃষককে নির্ধারিত ধান ঠিকই দিতে হতো। যদি তা দিতে না পারতো, তাহলে কৃষকের ওপর চলতো অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন। বংশপরম্পরায় চলতো এই ঋণের বোঝা। কৃষক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীদের টংক ঋণ শোধ

করতে হতো। অথচ তাদের জমির ওপর কোনো ধরনের অধিকার ছিল না। টংকের অতিমাত্রায় শোষণের ফলে গারো পাহাড় অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকদের (বেশির ভাগই হাজং কৃষক) আর্থ-সামাজিক অবস্থা একেবারেই নাজুক হতে থাকে।

অন্যদিকে হাজংদের মধ্যে সংগ্রামের যে একটা ঐতিহ্য ছিল, এই বিষয়টি সুসং জমিদারদের ভাগ্নে মণি সিংহ অনুধাবন করেছিলেন। ফলে তিনি যখন 'অনুশীলন' সদস্য, তখন তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থেই হাজংদের দলে ভেড়াতে চাইলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন–

"... ... আমাদের মধ্যে একটি চিন্তা আসে যে, ব্রিটিশ সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে খতম করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। বিপ্লব করা দরকার, সে জন্য চাই অনেক মানুষ, জঙ্গী লোক। নচেৎ কিছু করা যাবে না।

এই চিন্তা থেকে আমরা লোক সংগ্রহ করার কাজে মন দেই। আমরা আগেই শুনেছিলাম যে, হাজং সম্প্রদায় খুব জঙ্গী। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, যা 'হাজং বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। আমি ও আমার এক সমবয়সী সন্ত্রাসবাদ বন্ধু উপেন সান্যাল ঠিক করলাম, এই হাজংদের যদি দলে টানা যায়, তবে এক চমৎকার কাজ হবে। এই চিন্তা করে আমরা দুইজনে আমাদের গ্রাম সুসং দুর্গাপুর হতে মাইল দশেক দূরে কালীকাবাড়িতে যাওয়া স্থির করলাম। ... ... এই সময়টা হচ্ছে ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে।" (জীবনসংগ্রাম, পৃ. ২০)

কালীকাবাড়িতে মণি সিংহ ও উপেন সান্যাল হাজংদের হাতে জল গ্রহণ, বাঙালি পুরোহিত দিয়ে পূজা করানো ইত্যাদি সংস্কার করে ও সেখানে স্কুল তৈরির মাধ্যমে হাজংদের আস্থা অর্জন করেন। এবং তাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। পরবর্তীকালে ১৯২৮ সালে মণি সিংহ কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন।

১৯৩৫ সালে কমরেড মণি সিংহ দুর্গাপুরে তাঁর বাড়িতে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রত্যক্ষভাবে টংক প্রথার ঘৃণিত রূপ অনুধাবন করলেন। এরপর তিনি আবারও রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হয়ে মুক্তি লাভের পর ১৯৩৭ সালে দুর্গাপুরে আসেন। তখন টংকের শোষণ চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে আসে। সে সময় এক একরে ধান দিতে হতো পনের মণ। টংকের এ রকম পরিস্থিতিতে কৃষকদের যাপিত জীবনে সুস্পষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করে দারিদ্র্য। জীবনের প্রয়োজনেই এ অঞ্চলে হাজং কৃষকসহ মুসলমান কৃষকরাও এ অবস্থা থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে চাইলেন। কৃষকরা মণি সিংহকে অনুরোধ

করলেন, টংক আন্দোলনের পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। এ ক্ষেত্রে মণি সিংহের রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে ব্যক্তি মণি সিংহের কৃষকদের সাথে সম্পর্কের গুরুত্বই ছিল বেশি। প্রমথ গুপ্ত লিখেছেন–

"... কম্‌রেড্‌ মণি সিংহও মুক্তি লাভ করিয়া পরে তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে দেখার জন্য সুসং দুর্গাপুরে আসেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা... জমিদারগোষ্ঠী ও জনসাধারণের জীবন-জীবিকার কথা সম্যক জানিতেন, বিশেষ করিয়া সুসং পরগনার কৃষকদের অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত-শোষিত জীবনের প্রতিটি ঘটনা শুধু জানিতেন না, তাহা উপলব্ধিও করিতেন। সুসংয়ের টংক চাষীরাও মণি সিংহের স্বদেশী জীবনের কথা জানিতেন। মণি সিংহ সুসং আসিয়াছেন জানিয়া পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী কৃষকরা ও দশাল গ্রামের মুসলমান টংক চাষীরা তাহাদের আন্দোলনে সংগঠনে মণি সিংহের নেতৃত্ব কামনা করে। ইতিহাসের নির্দেশেই মেটিয়াবুরুজের ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কর্মী মণি সিংহ চির নির্যাতিত টংক চাষীদের সুকঠিন সংগ্রামের গুরুদায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেণ।"

(যে সংগ্রামের শেষ নেই, পৃ. ৪৯)

এরই মধ্যে মণি সিংহের যোগাযোগ ঘটে লেংগুড়া গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন কৃষক আদিবাসী নেতা ললিত সরকারের (হাজং) সাথে। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে কারা ভোগের পর সদ্যোমুক্তিপ্রাপ্ত ললিত সরকার (হাজং) এ সময় সক্রিয়ভাবে টংক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে তাদের একান্ত প্রচেষ্টায় হাজং অধ্যুষিত লেংগুড়া ও দশাল গ্রামে শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠে। যদিও জমিদারদের সাথে হাজংদের পূর্ববিরোধ এবং টংকের প্রবল অর্থনৈতিক শোষণের ফলে হাজং কৃষকদের মাঝে আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তাঁদের সংগঠিত করায় আন্দোলন শুরুর প্রক্রিয়া অনেকাংশেই ত্বরান্বিত হয়।

টংক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়

১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কমরেড মণি সিংহের সাংগঠনিক পরিচালনায় ও নেতৃত্বে গারো পাহাড় অঞ্চলে শুরু হয় টংক আন্দোলন। জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য মহাজনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনের নীতি ছিল অহিংস। তাদের দাবিগুলো ছিল–

১. টংক প্রথার উচ্ছেদ।
২. টংক জমিস্বত্ব।
৩. জোতস্বত্ব নিরিখ মত টংক জমির খাজনা নির্ধারণ।
৪. বকেয়া টংক মওকুফ।
৫. জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ইত্যাদি।[৫]

আন্দোলনের শুরু করায় মণি সিংহের সাথে তার জমিদার আত্মীয়দের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তবু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ইতিমধ্যে মণি সিংহ নিজেও তার টংকদার কৃষক গুল মামুদের টংক ধান মওকুফ করে দেন। খুব অল্প দিনের মধ্যে টংক আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। কৃষকরা টংক অভিশাপ থেকে সর্বোপরি বাঁচার তাগিদেই আন্দোলনে যোগদান করতে থাকলেন। আন্দোলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হাজং কৃষকদের মধ্যে পূর্বেকার জমিদারদের বিরুদ্ধে 'হাজং আন্দোলনের' বংশধরেরা প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আন্দোলনে যোগদান করলেন। এরই মধ্যে ১৯৩৮ সালে ময়মনসিংহ জেলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ফলে এবং কৃষক সমিতির নেতার নিরলস প্রচেষ্টায় আন্দোলনের জন্য সাংগঠনিক শক্তি আরো বৃদ্ধি পেল। এ অবস্থায় সমগ্র টংক কৃষকরা যখন টংক থেকে মুক্তির আশায় উন্মুখ, এ সময় পুলিশ কৃষকদের মাঝে প্রচার করতে লাগলো–'তোমরা যখন টংক ধান দিতে পারবে না, কিছু কিছু করে দাও।' কিন্তু কৃষকরা তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলো। তাঁরা অনেক জায়গাতেই পুরোপুরিভাবে টংক ধান দেওয়া বন্ধ করে দিলো। এ সময় জমিদার পুলিশের ভয় দেখিয়েও এক-চতুর্থাংশের বেশি ধান আদায় করতে পারলো না। বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারকে ভীষণভবে শঙ্কিত করে তুললো। তারা দেখল যে, কমিউনিস্টরা আদিবাসী কৃষক তথা সমগ্র টংক কৃষকদের মাঝে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার

করেছেন। ফলে রাজনৈতিক কারণেই সরকার টংক প্রথার সংস্কারের উদ্যোগ নিল। তারা ব্যবস্থা করলো জরিপের। জরিপে দেখা যায়, কোথাও কোথাও টংকের ধান একেবারে অর্ধেকে নেমে এসেছে। কৃষকদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে সরকার সিদ্ধান্ত নিলো, যদি কোনো কৃষক তার টংকের ধান আট কিস্তিতে পরিশোধ করতে পাওে, তবে সে এই জমির পুরোপুরি স্বত্ব পাবে। সরকারের এ রকম সংস্কারের সিদ্ধান্তে আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ হলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে টংক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

সরকারের ১৯৪০ সালে টংক প্রথার সংস্কার আন্দোলনকারীরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ বা বর্জন করেননি। তবে টংক প্রথা একেবারে উচ্ছেদ না হওয়ায় তাদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করেছিলো। আন্দোলনের এ পর্যায়ের প্রেক্ষাপটে আন্দোলনের সাংগঠনিক পরিচালনা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হয়। যার ফলে কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় রাজনীতির সাথে এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। তাই এই ক্ষেত্রে আন্দোলন পরিচালনা ও দিকনির্দেশনা অনেকাংশেই নির্ভরশীল হয়ে ওঠে কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটের ওপর। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় অনেক নেতাকর্মীকে। ১৯৪১-১৯৪২ সালে ছিল 'কৃষক সমিতির' সদস্যদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের কাল। এ সময় পাঁচু গোপাল ভাদুড়ী ও কমরেড আব্দুল্লাহ রাসুল ময়মনসিংহ জেলায় আসেন। তাঁরা 'কৃষক সমিতির' সদস্যদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪২ সালে কমরেড মণি সিংহ জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ফলে পার্টির নেতারা পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছিলেন। নেতাদের প্রচেষ্টায় উত্তরে হাজং অধ্যুষিত এলাকায় 'কৃষক সমিতি'র কর্মীসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেল।

১৯৪৩ সালে ময়মনসিংহ জেলার পঞ্চম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সুসং দুর্গাপুরে। সম্মেলনে টংক প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। জেলা সম্মেলনের পরপরই নেত্রকোনা মহকুমার 'কৃষক সমিতি' গঠিত হয়। ফলে মহকুমা পর্যায়ে আন্দোলনের জন্য সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বছর ১০-১১-১২ মে নালিতাবাড়ীতে (তৎকালীন জামালপুর মহকুমায়) অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন'। এখানে ১০-১২ হাজার কৃষক জমায়েত হয়েছিল। এখানেও টংকের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবু বিভিন্ন কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন তখনো শুরু করা হয়নি। এভাবে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৪৫ সালে (১৩৫০ বাংলা) দেখা দেয় মহামন্বন্তর। যার ফলে কৃষকদের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভাগ্য। মানুষের

সৃষ্ট এই মন্বন্তর ময়মনসিংহ জেলা পরিণত হলো নিরন্নে। চালের মূল্য সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেল। কৃষক-শ্রমিকের মাঝে দেখা দিল হাহাকার। মন্বন্তর মোকাবেলায় ময়মনসিংহ কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা অনেকাংশেই কৃষকদের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে দুর্ভীক্ষপীরিত কৃষকদের নিদারুণ অর্থনৈতিক অচলাবস্থায় ১৯৪৫ সালের ৪-৫ এপিল নেত্রকোনার নাগড়ার মাঠে অনুষ্ঠিত হয় 'সারা ভারত কৃষক সম্মেলন'। সম্মেলনে লক্ষাধিক কৃষকের জমায়েত হয়েছিল। যোগদান করেছিল পাহাড় অঞ্চলের হাজং নারী-পুরুষ কৃষকরা। মণি সিংহ লিখেছেন–

"... ... বিপুলসংখ্যক হাজং উপজাতি মেয়ে পিঠে তাঁদের শিশুসন্তানদের বেঁধে সত্তর-আশি মাইল হেঁটে এসেছিলেন। পথে তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তা ছাড়া ছিল হাজংদের এক বিরাট ভলান্টিয়ার বাহিনী।... ... জনসমুদ্রের সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ইতোপূর্বে স্মরণকালের মধ্যে এত বিশাল কৃষক সমাবেশ বাংলায় আর হয়নি।... ...।"

(জীবনসংগ্রাম, পৃ. ৬৪, ৬৫)

খোকা রায় লিখেছেন– '১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে মৈমনসিংহের নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কৃষক সমিতির জনপ্রিয়তা আরো প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। ... ...সাত বৎসর পরে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সভার ওই সম্মেলন ছিল বাংলার কৃষক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।'

(সংগ্রামের তিন দশক, পৃ. ৩০)

এই সম্মেলনে পুনরায় টংক প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূল কথা, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের প্রস্তুতির পূর্ণতা পায়। যা হাজং কৃষকসহ সব কৃষককর্মীর মাঝে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল।

টংক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

টংক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়কাল চিহ্নিত করা যায় ১৯৪৬ সাল হতে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের আগ পর্যন্ত। এ সময়ে গারো পাহাড় অঞ্চলে আন্দোলনের জন্য সাংগঠনিক অবস্থা ছিল খুবই শক্তিশালী। আন্দোলনে ময়মনসিংহ জেলা, নেত্রকোনা মহকুমা কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃবৃন্দ সার্বিক দিক দিয়ে নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় মণি সিংহ ছিলেন আত্মগোপনে। সুসং দুর্গাপুরের স্কুল মাঠে সভার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয়। সভায় যোগদানের জন্য পাহাড় অঞ্চল থেকে প্রায় পাঁচ হাজার আদিবাসী হাজং নারী-পুরুষ সশস্ত্র অবস্থায় আসলো। সভাস্থলে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন ছিল। তারা থানাসংলগ্ন রাস্তা কাঁটাতার দিয়ে আটকিয়ে দিলো। বিক্ষুব্ধ কৃষক-জনতা স্লোগান দিতে দিতে কাঁটাতারের বেষ্টনী গুঁড়িয়ে দিলো। এ সময় ভলান্টিয়ার বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন বল্লভী বক্সী। জনতার বিক্ষোভের মুখে সশস্ত্র পুলিশ থানার ভেতর গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো। বিক্ষোভকারীরা টেলিগ্রামের তার ছিঁড়ে ফেললো। এ ঘটনার পর সমগ্র গারো পাহাড় অঞ্চলে তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো আন্দোলন। আদিবাসী হাজং নেতা ললিত সরকার (হাজং), বিপিন গুণ (হাজং), মঙ্গলচাঁদ সরকার (হাজং), কাঙ্গাল দাস (হাজং)–এমন অসংখ্য নেতাকর্মী গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করছিলেন। অন্যদিকে মহিলা আদিবাসী হাজং নেত্রীদের মধ্যে ছিলেন রাশিমণি, ভদ্রমণি, কলাবতী, স্বরূপা, অশ্বমণি প্রমুখ। তাঁরাও সাধারণ কৃষকদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন।

আন্দোলনের বিষয়টি সরকারের নজরে আসে। এ সময় ব্যাস্টিন সাহেব জেলা শাসকের দায়িত্ব নিয়ে ময়মনসিংহ আসেন। টংক এলাকায় সংগঠিত গ্রামগুলোর ওপর তার কুদৃষ্টি পড়লো। পাহাড় অঞ্চল হলো তার আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সুসংয়ের বিরিশিরি, রানীখং, হালুয়াঘাটের বিরুই-ডাকিনী, নালিতাবাড়ীর বাওইদাবা প্রভৃতি ক্যাথলিক মিশনের সাহায্য নিয়ে গারো পাহাড় অঞ্চলের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করলেন। তার ইচ্ছেতেই এ অঞ্চলে সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো হলো। বিরিশিরিসহ অনেক জায়গায় ক্যাম্প বসানো হলো। টংক ধান পরিশোধের জন্য নোটিশ ও কোর্ট অব ওয়ার্ডের সার্টিফিকেট জারি করা হলো।

এত কিছুর পরও টংক কৃষকরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তারা টংক ধান দেবেন না। টাকায় খাজনা দিতে রাজি আছেন। এ সময় সংগঠিত গ্রামগুলোতে পুলিশ টংক ধান আদায় করতে গেলেও প্রাণভয়ে পালিয়ে আসতো। এমন অবস্থায় ব্যাস্টিনের টনক নড়লো। তিনি এ অঞ্চলে বিনা অনুমতিতে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। বিদেশি মিশনারির খ্রিস্টানরা আদিবাসী কৃষকদের আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিলেন। পাদ্রিরা ব্যাস্টিনের পক্ষে দালালি শুরু করলো। ফলে কয়েকটি আদিবাসী গ্রাম ব্যাস্টিনের পক্ষাবলম্বন করলো । আদিবাসীদের এসব দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে সরকারি সশস্ত্র বাহিনী ১৯৪৭ সালের ৭ জানুয়ারি লেংগুড়া, জিগাতলা, চৈতন্যনগর, ভরতপুরসহ প্রায় ১২টি গ্রাম আক্রমণ করলো। লেংগুড়া ও কুমারগাতিতে কৃষক সমিতির অফিস ভাঙলো। কৃষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হলো মিথ্যা মামলা। জনসাধারণকে ভয় প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হলো বিমান মহড়া। অন্যদিকে আন্দোলনকারী কৃষকরা আত্মরক্ষার জন্য গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করলো। এবং প্রয়োজনে তা প্রয়োগ করতে সচেষ্ট থাকলো। আন্দোলনকারী কৃষকদের কোনো আধুনিক অস্ত্র ছিল না। এ ক্ষেত্রে হাজং কৃষকরা ব্যবহার করতো তীর, ধনুক, বল্লম, দা ইত্যাদি। আন্দোলনকারী মহিলা কৃষকরা তৈরি করলো 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। এই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একজন জনপ্রিয় নেত্রী ছিলেন রাশিমণি হাজং। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য অনেক আদিবাসী হাজং নারী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আন্দোলনের এ পর্যায়ে ১৯৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি ঘটে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। এই দিন কুমুদিনী হাজং নামের এক গৃহবধূকে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হন রাশিমণি হাজং ও সুরেন্দ্র হাজং।

দিনটির সাল ও তারিখ নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট বিতর্ক। কমরেড মণি সিংহ তাঁর 'জীবনসংগ্রাম' বইয়ে (পৃ. ৭৭) উল্লেখ করেছেন, দিনটি ছিল ১৯৪৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর, আবার তাঁর একই বইয়ে (পৃ. ৯৮) ৩০ জানুয়ারি দেওয়া আছে। প্রমথ গুপ্ত তাঁর 'যে সংগ্রামের শেষ নেই' বইয়ে (৯৮ ও ৯৯ পৃ.) কৃষকদের ওপর অত্যাচারের ঘটনাপ্রবাহসহ ১৯৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি লিখেছেন। তিনিই আবার একই বইয়ে (১১৮ ও ১৩৩ পৃ.) ৩০ জানুয়ারি লিখেছেন (সাল ও ঘটনাপ্রবাহ ছাড়া)। অন্যদিকে সুসং দুর্গাপুরের রাশিমণি ম্যামোরিয়াল ট্রাস্ট ৩১ জানুয়ারি রাশিমণির শহিদ দিবস হিসেবে পালন করেন। তাঁরা সাল হিসেবে ধরেন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ। আবার সে সময়কার ভারতের গণপরিষদের সদস্য কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী হাজং কৃষকদের ওপর সরকারি বাহিনীর অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে ১৯৪৭ সালের ৪ মার্চ পণ্ডিত

জওহরলাল নেহেরুর কাছে একটি চিঠি দেন (যা আমি এই বইয়ে উল্লেখ করেছি)। চিঠির বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়, ঘটনাটি ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে ঘটেছিল। চিঠি থেকে আরো জানা যায়, যার নির্দেশনায় তখনকার সরকারি বাহিনী কৃষকদের ওপর অত্যাচার করেছিল, সেই তৎকালীন ময়মনসিংহের জেলা শাসক ব্যাস্টিন ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে জেলা শাসকের দায়িত্ব পান। অন্যদিকে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য মতে, ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের ২১ তারিখ ব্যাস্টিন ময়মনসিংহের জেলা শাসক নিযুক্ত হন। সাল ও তারিখ নিয়ে সবার মতপার্থক্য থাকলেও ব্যাস্টিন জেলা শাসক থাকা অবস্থায় ঘটনাটি ঘটেছিল−এ কথা মোটামুটি নিশ্চিত। তাই মণি সিংহের বইয়ের তথ্য মতে, দিনটি ১৯৪৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনিই আবার একই বইয়ে জানুয়ারি মাসকে সমর্থন করেছেন, যা আগেই উল্লেখ করেছি। আমার জানা মতে, এ যাবৎকাল পর্যন্ত কোনো লেখকই ৩১ ডিসেম্বর লেখেন নাই। আমি আরো কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি− টংক নেতা কমরেড ক্ষিতীশ চক্রবর্তীর ছেলে ও টংক নেতা কমরেড শশীন চক্রবর্তীর ভাগ্নে দিলীপ চক্রবর্তী তাঁর ‘গারো পাহাড়ের লালফুল’ বইয়ে (১৪ পৃ.) ১৯৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি লিখেছেন। মতিলাল হাজং ‘আদিবাসী প্রবন্ধ সংকলন’-এ তাঁর প্রবন্ধে (৭১ পৃ.) লিখেন−দিনটি ছিল ১৯৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি। কমরেড নিবারণ পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন, ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে (নিবারণ পণ্ডিত, খগেশ কিরণ তালুকদার, পৃ. ১৬১)। যদিও তাঁরা কেউই সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ করেন নাই। আবার তখনকার নেত্রকোনা মহকুমার জনসংযোগ কর্মকর্তা খালেকদাদ চৌধুরী তাঁর ‘শতাব্দীর দুই দিগন্ত’ বইয়ে (পৃষ্ঠা. ৭৪, ৭৫, ৭৬) উল্লেখ করেছেন, ঘটনাটি ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে ঘটেছিল। এই বই থেকেই জানতে পারি, ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে ব্যাস্টিন ছিলেন ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। যা ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দেওয়া তথ্য ও সোমনাথ লাহিড়ীর চিঠি অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু প্রমথ গুপ্ত সে সময়ে মাঠ পর্যায়ে নেতৃত্বে ছিলেন এবং তাঁর ‘যে সংগ্রামের শেষ নেই’ বইয়ে (পৃ. ৯৯) বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ৩১ জানুয়ারি উল্লেখ করেছেন এবং রাশিমণি ম্যামোরিয়াল ট্রাস্ট ৩১ জানুয়ারিকে রাশিমণির শহিদ দিবস হিসেবে পালন করেন, সে ক্ষেত্রে ৩১ জানুয়ারি তারিখই যুক্তিযুক্ত। আবার রাশিমণি ম্যামোরিয়াল ট্রাস্টের ও খালেকদাদ চৌধুরীর মত অনুযায়ী সালটি যদি ১৯৪৬ ধরি তাহলে দেখা যায়, সোমনাথ লাহিড়ী যে চিঠি দিয়েছিলেন, দীর্ঘ এক বছরেরও পরে ১৯৪৭ সালের ৪ মার্চ তা লেখার কোনো প্রশ্নই আসে না। এবং ব্যাস্টিন জেলা শাসকের দায়িত্ব পেয়েছিল ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে বা

ডিসেম্বরে। তাহলে ব্যাস্টিনের সময়ে ঘটনাটি কী করে ঘটল? সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, দিনটি ছিল ১৯৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি।

যা-ই হোক, ১৯৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি এই দিনে সুসং দুর্গাপুরের সোমেশ্বরীর অপর পারে বিরিশিরি হতে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল' বাহিনীর একদল সৈন্য প্রবেশ করে। তারা হাজং বাড়িগুলোতে আন্দোলনকারীদের খোঁজ করে। সৈন্যরা হাজং কৃষকদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে। ধর্ষণ করে দু'জন হাজং মেয়েকে। তারা আন্দোলনকারীদের নেতৃস্থানীয় লংকেশ্বর হাজং ও তার ভাইদের খোঁজ করে। এ সময় গ্রামটি ছিল প্রায় পুরুষশূন্য। সৈন্যরা নেতাদের না পেয়ে লংকেশ্বর হাজংয়ের নববধূ কুমুদিনী হাজংকে ধরে ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যেতে চাইলো। কুমুদিনীর চিৎকার ও মুক্তির আর্তনাদের খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। এমন সময় রাশিমণি হাজংয়ের নেতৃত্বে কয়েকজন ভলান্টিয়ার বৈঠক করছিল। আক্রমণের খবরে তাঁরা প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে উঠলো। নেতারা তখনো দ্বিধান্বিত, দিনের আলোতে সৈন্যদের আক্রমণ করা ঠিক হবে কি না। কিন্তু রাশিমণি হাজং এত কিছুর তোয়াক্কা করলেন না। রুদ্রমূর্তিতে তিনি এগিয়ে চললেন। চিৎকার করে বললেন, 'ময় তিমাত্, তিমাতের ইজ্জত রক্ষা ময় করিব, না-তে মরিব। তরা নিতি লয়া বয়য়া থাক।' এই বলে তিনি ছুটতে থাকলেন কুমুদিনী হাজংকে রক্ষার জন্য। পেছনে আরো ১০-১২ জন ভলান্টিয়ার বাধ্য হয়ে তাকে অনুসরণ করলো। এদিকে সুরেন্দ্র হাজং দক্ষিণ দিক হতে ২০-২৫ জনের একটি দল নিয়ে এগিয়ে আসলো রাশিমণিকে সাহায্যের জন্য। রাশিমণি দীপ্র কণ্ঠে সৈন্যদের বললেন কুমুদিনীকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু সৈন্যরা তখনো কুমুদিনীকে টেনে-হিঁচড়ে ক্যাম্পের দিকেই নিয়ে যাচ্ছিল। রাশিমণি ভয়ংকর রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুমুদিনীকে ধরে রাখা সৈন্যটির ওপর। তাঁর দায়ের আঘাতে সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারালো। শুরু হলো লড়াই। সৈন্যরা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগলো। সৈন্যদের লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়তে লাগলেন পুরুষ ভলান্টিয়াররা। সৈন্যদের একটি গোলার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন রাশিমণি। তৎক্ষণাৎ বর্শার আঘাতে সুরেন্দ্র সৈন্যটির বক্ষ বিদীর্ণ করলো। মুহূর্তের মধ্যে আরেকটি গোলার আঘাতে সুরেন্দ্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েলেন। শহিদ হলেন হাজংমাতা রাশিমণি ও সুরেন্দ্র হাজং। লড়াই চলাকালীন কয়েকজন হাজং নারী কুমুদিনীকে নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। সরকারি বাহিনীর সাথে হাজং কৃষকদের দুর্বার প্রতিরোধ চললো প্রায় তিন ঘণ্টা। লড়াইয়ে সরকারি বাহিনীর দুইজন সৈন্য নিহত হলো। আহত হলো, প্রায় ৮-১০ জন। লড়াইয়ে রাশিমণি হাজং ও

সুরেন্দ্র হাজংয়ের আত্মবলিদান অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো। এই গৌরবোজ্জ্বল লড়াইয়ে শহিদ বীরমাতা রাশিমণি টংক আন্দোলনের প্রথম শহিদ নারী। সেই দিনকার সেই গৃহবধূ কুমুদিনী হাজংয়ের বর্তমান বয়স প্রায় ৮৫ বছর। তিনি সেদিনকার ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমি তো সেদিন মাসির জন্যই রক্ষা পেয়েছিলাম। সে সময়ে ভয়ে প্রায় জ্ঞানই হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েকজন আমাকে ধরে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এলো। তারপর আর কিছু বলতে পারি না।

বহেরাতলীর ঘটনায় পুলিশ কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো। তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো আদিবাসী হাজং কৃষকদের ওপর। ১২ ফেব্রুয়ারি লেংগুড়া গ্রামে ১২টি কৃষকদের ঘর ভেঙে ফেলা হলো। আদিবাসী নেতা ললিত সরকারের (হাজং) সমস্ত ধান লুঠ করলো। নির্যাতন করলো তাঁর পরিবারের সদস্যদের ওপর। সুরেন্দ্র হাজংয়ের গ্রাম চারুয়াপাড়ার বাড়ি ভেঙে ফেলা হলো। নির্যাতন করা হলো গ্রামবাসীদের। পুলিশ কমরেড মণি সিংহ ও ফণী গোস্বামীর বাড়ি আক্রমণ করলো। বিভিন্ন জায়গায় কৃষক সমিতির অফিস ভাঙা হলো। এর আগে ৭ ফেব্রুয়ারি নয়নকান্দি, সানখোলা, কমলপুর, মুন্সীপাড়া, নলগড়া গ্রাম একেবারেই ধ্বংস করে দেওয়া হলো। বন্ধ করে দেওয়া হলো ময়মনসিংহের ১৬-১৭টি ছাপাখানা। পুলিশের সন্দেহ ছিল, এসব ছাপাখানায় সরকারের বিরুদ্ধে ইশতেহার ছাপানো হয়। এত কিছুর পরও পুলিশ ক্ষান্ত হয়নি। তারা বগাঝড়া গ্রামে ব্রজমনীসহ অনেক কৃষক মেয়ের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন করলো। হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দীতে কৃষক সমিতির অফিস ভাঙলো। লুঠতরাজ চালালো জলধর পাল ও জিতেন মৈত্রের বাড়ি। আরো লুটতরাজ কায়েম করা হলো ঝিনাইগাতি, কংসা, ধানসাইল প্রভৃতি গ্রামে। নালিতাবাড়ীর কালীনগর, ভটপুর, কান্দুলী গ্রামের রাজবংশী কৃষকদের ওপর অত্যাচার করা হলো। এ সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি কলকাতা হতে ডা. সুবল বেরাকে পাঠায় আক্রান্ত অঞ্চলে। কিন্তু ব্যাস্টিন Bengal Special Power Ordinance জারি করে ডা. সুবল বেরাকে গ্রেপ্তার করে ময়মনসিংহে পাঠিয়ে দেয়। এ অঞ্চলে পৌঁছতে দেওয়া হলো না রেডক্রসের সাহায্যও।

কলকাতা থেকে একটি বেসরকারি তদন্তদল ঘটনা তদন্তের জন্য আসে। এ দলে ছিলেন জ্যোতি বসু, ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য্য ও রিপোর্টার প্রভাত দাশগুপ্ত। কিন্তু ব্যাস্টিনের আদেশে পুলিশ তাদের ঘটনাস্থলে যেতে দেয়নি। তাদের থানায় আটক রাখা হয়। জ্যোতি বসুকে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বহিষ্কার করা হয়। জ্যোতি বসু পরবর্তীকালে 'রেইন অব টেরর ওভার দ্য

হাজংস; আ রিপোর্ট অব দি এনকোয়ারি কমিটি’ নামে একটি ফাইল প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহেরুর কাছে পেশ করেন।

কমরেড মণি সিংহের নামে তখনো হুলিয়া। মণি সিংহসহ আন্দোলনের অনেক নেতাই তখন আত্মগোপনে। তাদের ধরার জন্য সেনা ক্যাম্প বসানো হলো। চারদিকে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হলো। এ সময় ব্যাস্টিন বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া আরম্ভ করলো। লুঠ করলো কৃষকদের সঞ্চিত খাদ্য। অনেক স্থানেই ধ্বংস করলো হাজংদের কামাখ্যা মন্দির। আবারও ধর্ষণ চালানো হলো আদিবাসী নারীদের ওপর। সারা গারো পাহাড় অঞ্চল সরকারি বাহিনীর তাণ্ডবে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। সে সময় ভারতের গণপরিষদ সদস্য হিসেবে কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী ১৯৪৭ সালের ৪ মার্চ পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরুকে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন–

‘বেস্টিনের এই অভিযানের পেছনে আরও একটি গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে বলে আমরা সন্দেহ করি। এই উদ্দেশ্য হলো, বাংলা ও আসাম সীমান্তে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা। এ কারণেই আমরা অনুমান করি, বাংলার গভর্নর ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে সুসং সফরকালে আদিবাসী বিশেষজ্ঞ বলে কথিত মি. বেস্টিনকে ময়মনসিংয়ের জেলা শাসক হিসেবে নিয়োগ করেন। সাধারণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হাজং জনগণের ওপর ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে পুলিশ-মিলিটারি অপারেশন শুরু হয়। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যই হাজংদের মধ্যে মিশনারিরা জোর প্রচার চালাচ্ছে, যাতে করে তারা সমস্ত রাজনৈতিক দল থেকে নিজেদের বিছিন্ন রাখে এবং মিশনারি ও সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকে।’

আইন-শৃঙ্খলার জন্য জওয়াহেরলাল নেহেরুর সাহায্য চেয়ে চিঠিতে তিনি আরো লিখেছেন–

‘সরকারি হিন্দু ও মুসলমান কায়েমি স্বার্থবাদীদের গণ-অভ্যুত্থান ও গণ-সন্ত্রাসের ভুয়া কাহিনী ছড়াচ্ছে। নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে হাজংরা হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত হয়। তা ছাড়া এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, যার ফলে বিপুল সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করার কারণ থাকতে পারে। ... ... আইন-শৃঙ্খলা প্রবর্তনের নামে বর্বরতা চালানো যেতে পারে না। কর্তৃপক্ষ বে-আইনিভাবে একশ’টি বাড়িঘর ধ্বংস করেছে। ৫০ হাজার টাকা নগদ ও একশত মণ ধান লুট করেছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ ৮০ জনকে জখম করেছে ও কমপক্ষে ২০ জন মহিলার শ্লীলতাহানি করেছে এবং চারজন নারী-পুরুষকে হত্যা করেছে।’[৬]

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা আন্দোলনের চরমভাবে বিরোধিতা

করলো। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের পাশাপাশি তারাও অত্যাচার শুরু করলো কৃষকদের ওপর। এমনকি মাঝে মাঝে কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা কৃষকদের দল ত্যাগের উপদেশ দিতেন।

প্রমথ গুপ্ত লিখেছেন–

'ব্যাস্টিনের এই অত্যাচারের সময় রিলিফ দেওয়া ও দমনমূলক কাজ প্রত্যক্ষ করার জন্য কয়েকটি উপদল, ইহার মধ্যের বিশিষ্ট কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও ভূতপূর্ব রাজনৈতিক বন্দীও ছিলেন, পাহাড় সীমান্ত অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তাহারা সংগঠিত গ্রামগুলোতে সভা, বৈঠক করিয়া কৃষকদের লালঝাণ্ডা ফেলিয়া তেরঙ্গা পতাকা তুলিতে ও কৃষক সমিতি ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগ দিতে হিতোপদেশ দেন।'

(যে সংগ্রামের শেষ নেই, পৃ. ১০২)

কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার এ রকম বক্তব্য সত্ত্বেও আন্দোলনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ হাজং কৃষকরা বহুলাংশেই প্রভাবমুক্ত থেকেছেন। ফলে আন্দোলন নির্দিষ্ট পথেই এগিয়ে যাচ্ছিল। টংক আন্দোলনের এ পর্যায়ে নেত্রকোনার বিভিন্ন গ্রামে শুরু হয় তেভাগা[৭] আন্দোলন। যেহেতু তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্বেও ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, তাই দুটি আন্দোলনের স্বরূপ একেবারেই ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সাংগঠনিকভাবে নেত্রকোনায় দুটি আন্দোলন একসাথেই চলছিল। এ সময় সমগ্র ময়মনসিংহে জেলা টংক ও তেভাগা আন্দোলনের জোয়ারে উত্তাল হয়ে পড়লো। এ রকম পরিস্থিতে অবিভক্ত ভারতে জেলার শেষ কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মুক্তাগাছার মহারাজের বাড়িতে। সেখানে টংকনেত্রী কলাবতী হাজং তার ওপর সরকারি বাহিনীর অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, 'আমি আর কইতে পারব না, কেউ কইয়ে দে।'

যা-ই হোক, অন্য অনেকের মতো কৃষকদেরও হাজারো মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো। ফলে টংকপ্রথার কোনো সুরাহা না হয়েই দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লো।

তৃতীয় পর্যায়ে টংক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

দেশবিভাগের পরে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সুসং দুর্গাপুরে ১০ হাজার, নালিতাবাড়ীতে ১৫ হাজার, হালুয়াঘাটে দুই হাজার, আদিবাসী কৃষক স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করলেন। তখনো হুলিয়া ঝুলছে টংক আন্দোলনের নেতা মণি সিংহ, ললিত সরকার (হাজং), বল্লভী বক্সী, প্রমথ গুপ্ত, জলধর পালসহ অসংখ্য কৃষক নেতা-কর্মীর ওপর। সে সময় তারা অনেকেই আত্মগোপনে। শত শত কৃষক নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কাছে অভিযুক্ত সব নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তুলে নিতে অনুরোধ করলেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা'র নেতারা অভিযুক্তদের মুক্তির জন্য সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করলেন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর মি. বারোজ পাহাড়ি অঞ্চল পরির্দশনে এলে 'কৃষক সমিতি'র পক্ষ হতে জামেশ্বর ও চন্দ্র সরকার (হাজং) পাক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে অবিলম্বে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আবেদন জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করলেন। মি. বারোজ সব কিছু বিবেচনা করবেন বলে তাদের আশ্বাস করলেন। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, সব কিছুই ছিল নিষ্ফল। পূর্ব পাকিস্তানের সরকার টংক নেতা-কর্মীদের মুক্তি, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ তো দূরের কথা, উল্টো তারাই সাহায্য করলো জমিদারদের খাজনা আদায়ের জন্য। গারো পাহাড় অঞ্চলে জমিদারদের সাহায্যের জন্য নতুন করে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হলো। আমলা ও পুলিশ কে সাহায্যের জন্য গঠন করা হলো আনসার বাহিনী। কুখ্যাত এই আনসার বাহিনীর এই জেলার 'সালা-রে-সুবা' হলো উগ্র সাম্প্রদায়িক মোনায়েম খান।

নিবারণ পণ্ডিত তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন– 'কৃষক আন্দোলনের ফলে যেসব জমিদার জোতদার হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল পূর্ব পাকিস্তানের সরকার ঐ জমিদারদের মদৎ দিয়া চাঙ্গা করিয়া পুনরায় টংক আদায়, খাজনা আদায়, বকেয়া ধান ইত্যাদি আদায় করিবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিল।'[৮]

সরকারের সাহায্যে পুনরায় জমিদাররা পাহাড় অঞ্চলে ত্রাসের রাজ্য কায়েম করলো। টংক আদায়ের নামে নতুনভাবে অত্যাচার শুরু করলো কৃষকদের ওপর। বহু জায়গায় সরকারি বাহিনী কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের

ওপরও হামলা চালালো। ময়মনসিংহ শহরের সানকিপাড়া কাচিঝুলির এক মিছিলে সরকারি গুণ্ডাদের হামলায় আহত হলেন কমিউনিস্ট নেত্রী জুঁইফুল রায় ও পূর্ণিমা বক্সী।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বহু প্রথিতযশা কমিউনিস্ট পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় পাড়ি জমালেন। ফলে সে সময়ে পার্টি আংশিকভাবে বিপর্যস্ত হলো। তাই টংক আন্দোলনের সাংগঠনিক শক্তি অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এ অবস্থায় ভারত-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো ১৯৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায়। এখানেই উত্থাপিত হয় বহুল আলোচিত বি. টি. রণদীভে থিসিস। সেখানে বি. টি. রণদীভের বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো–

১. ভারত ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে যে স্বাধীনতা লাভ করেছে, সে স্বাধীনতা ভুয়া।

২. ভারতের বুর্জোয়ারা, বিশেষত বৃহৎ বুর্জোয়ারা আপসের পথ গ্রহণ করে ইতিমধ্যে সাম্রাজবাদের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং সেভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. ভারতের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিলম্বিত হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বপরিসরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। অতএব, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এ দুটি বিপ্লব একত্রে গেঁথে নিয়ে ভারতের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র গ্রহণ করেছে।

৪. পার্টি এত দিন দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী নীতি অনুসরণ করে চলছে। সংস্কারবাদের সে পথে পরিত্যাগ করে পার্টিকে বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। নবচেতনাপ্রাপ্ত জনগণও সে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত।[৯]

থিসিসে তিনি স্পষ্টভাবে সবাইকে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানান। দারুণ উৎসাহ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির এ কংগ্রেসে থিসিসটি গৃহীত হয়। এই থিসিসের সমর্থন জানিয়ে ভবানী সেন সে সময়কার হায়দরাবাদে তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষকদের সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন এবং সবাইকে তা অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানান।

এই কংগ্রেসেই পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। কংগ্রেসে উপস্থিত মণি সিংহসহ কেন্দ্রীয় কমিটির সব নেতাই রণদীভের থিসিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কংগ্রেসের পর পুলিশের দমননীতির ফলে সব কমরেডই আত্মগোপনে চলে যান। এরপর ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

খুবই গোপনে লালমনিরহাটের এক গ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জেলার কৃষক প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিন দীর্ঘ এই সম্মেলনের আলোচনায় বলা হয়, পাকিস্তান সরকার কৃষকদের স্বার্থে কখনোই কাজ করবে না। তারা জমিদারদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাবতীয় কাজ করেছে। কৃষকদের জন্য স্বেচ্ছায় ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ নেই। এমন পরিস্থিতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই। সিদ্ধান্ত হয় নতুন উদ্যমে কৃষক আন্দোলন শুরু করার। এখানে টংক আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মণি সিংহ, খোকা রায়, প্রমথ গুপ্ত প্রমুখ।

মূল কথা, লালমনিরহাটের সম্মেলনে নেতাদের আলোচনায় সশস্ত্র সংগ্রামের ইঙ্গিত বহন করছিল। এ সময় গারো পাহাড় অঞ্চলের কৃষকদের সমস্যাগুলো কোনোভাবেই সমাধান হচ্ছিল না। বরঞ্চ পাক সরকার দিনদিনই চড়াও হচ্ছিল আদিবাসী কৃষকদের ওপর সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের ওপর।

টংক আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়

আদিবাসী কৃষকদের প্রতি পাকিস্তানি শাসকবর্গের বিরূপ মনোভাব। কমিউনিস্ট পার্টিতে রণদীভের থিসিসের প্রভাব, ভবানী সেনের 'তেলেঙ্গানার পথে চল' আহ্বান–এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হালুয়াঘাটের নাগের পাড়ায় ময়মনসিংহ জেলা কমিউনিস্ট পার্টির এক গোপন সভা হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় জমিদার ও আমলাদের যে কোনো আক্রমণ প্রতিরোধ করার। এই সভায় নেতাদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ দেখা যায়। তাদের মধ্যে প্রধান যে প্রশ্নগুলো উঠেছিল, সেগুলো হলো–

১. সদ্যঃস্বাধীনতালব্ধ পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষকদের আন্দোলনে নিক্ষেপ করা এখনই ঠিক হইবে না। লীগ সরকার সাধারণ মুসলমান জনতাকে ভুল বুঝাইতে সুযোগ পাইবে।

– (সুনির্মল সেন)

২. এই মুহূর্তে শুধুমাত্র সুসংগঠিত হাজং অঞ্চল হইতে সংগ্রাম শুরু করিলে 'ভ্যানগার্ডিজম' করা হইবে।

–(প্রমথ গুপ্ত)

৩. কোনো কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করার বাসসংগঠন নাই। এই জন্য সময় ও প্রস্তুতির প্রয়োজন।[১০]

–(জলধর পাল)

এ ছাড়া কমরেড ক্ষিতীশ চক্রবর্তী সংগ্রাম শুরু করার ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, হাজং এলাকায় যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, এবং সাধারণ কৃষকদের মাঝে যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে, তাতে এখনই এই এলাকায় জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলা এবং হাজং আদিবাসীদের জঙ্গি আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেওয়া ঠিক হবে না। সাধারণ কৃষকরা এই আন্দোলনে যোগ দেবে কি না সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। নেতাদের

মধ্যে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই বৈঠকে উপস্থিত মণি সিংহ, খোকা রায়, রবি নিয়োগী, পুলিন বক্সী, আলতাব আলী, ললিত সরকার (হাজং) প্রমুখ নেতার সমর্থনে কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে টংক আন্দোলনকে জঙ্গি আন্দোলনে রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে সময় ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ও সুনির্মল সেন ছাড়া সব কমরেডই এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। প্রায় সব কমরেডই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার কাজে নেমে পড়েন। বিভিন্ন জায়গায় পার্টির কর্মী ও কৃষক সমিতির সদস্যদের জঙ্গি আন্দোলনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়।

এবার আন্দোলনে কৃষকদের মাঝে স্লোগান উঠলো, 'জান দিব তবু ধান দিব না', 'টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই', লাঙ্গল যার জমি তার'। আন্দোলন তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো সারা গারো পাহাড় অঞ্চলে। টংক নেতারা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, এ পর্যায়ে সরকারের দমননীতি হবে ভয়ংকর, হলোও তা-ই। পাহাড়ের দুই-তিন মাইল অন্তর অন্তর সরকার পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করল। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে পাহাড় অঞ্চলে ১০-১২টি ক্যাম্প স্থাপন করা হলো। সেখানেই জঙ্গি নেতা-কর্মীদের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো।

সরকারি বাহিনীর তাণ্ডবে আবারও কেঁপে উঠলো সমগ্র পাহাড় অঞ্চল। এরই মধ্যে ঝিনাইগাতিতে দুইজন গারো মেয়ে, মধ্যকুড়ায় তিনজন হাজং মেয়ে আনসারদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হলো। সালধা ও রাজবংশী গ্রাম আনসাররা লুট করল। দীর্ঘ সময়ের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষকরা বিক্ষোভের আগুনে জ্বলে উঠলেন। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সশস্ত্র প্রতিরোধে। ভলান্টিয়ার বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় টংক ধান আটকে নেমে পড়লো। এ সময় পার্টি ও কৃষক সমিতির স্লিপ ছাড়া ধান, চাল কোথাও আনা-নেওয়া করা যেত না। ১৯৪৯ সালের ৮ জানুয়ারি নীলচাঁদ হাজংয়ের কুড়ি মণ টংক ধান চৈতন্যনগর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ভলান্টিয়ার বাহিনী তা উদ্ধার করে নীল চাঁদের গোলায় ফিরিয়ে দিলো। টংক ধান আটকের সাফল্য কৃষকদের মধ্যে আশার সঞ্চার করলো। সাধারণ মানুষের সমর্থন আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি করলো। ১৫ জানুয়ারি কলমাকান্দা বটতলায় আবারও টংক ধান আটক করা হলো। পরদিন দারোগা ছয়জন সশস্ত্র পুলিশ, চৌকিদার ও আনসার নিয়ে বটতলা গ্রামে হামলা করলো। তারা হাজংপাড়ায় গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। অতর্কিত গোলার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো প্রাণেশ হাজং নামে এক তরুণ। কথিত আছে, মৃত্যুপথযাত্রী এই তরুণ নিজের রক্ত পাণ করে মৃত্যুর পূর্বে জল তেষ্টা মিটিয়েছিলেন। যা একেবারেই হৃদয়বিদারক। সেদিন পুলিশ ৫ জন হাজং কৃষককে নিদারুণভাবে প্রহার করে। নির্যাতনে এক কৃষক পুলিশকে টংক ধানের খোঁজ দিয়ে দেয়। তখন পুলিশ ২৫

মণ টংক ধান গরুর গাড়িতে বোঝাই করে চলে আসতে চাইলে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী তাদের গতিরোধ করে। ফলে গ্রামবাসীর সাথে পুলিশের লড়াই বাধলো। পুলিশ গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। কৃষকরা মাটিতে শুয়ে আত্মরক্ষা করলেন। তারা সমস্বরে আওয়াজ তুললেন, 'জান দিব তবু ধান দিব না।' হ্যাঁ, তারা ধান দেননি। মৃত্যুভয়হীন কৃষকরা ধানের গাড়ি আটকিয়ে রাখলেন। এ সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে দারোগার হুকুমে ধান বোঝাই গাড়িটি মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে পুলিশ চলে গেল। এ প্রতিরোধে দুজন কৃষক মারাত্মকভাবে আহত হলো।

বটতলায় গুলিবর্ষণের খবরে পরদিন লেংগুড়া থেকে কৃষক সমিতির ৪০ জন জঙ্গি সদস্য বটতলায় আসলো। তারা আহত দুজন কৃষককে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলেন। এখানে জঙ্গিরা ছোট সভা করে শত্রুদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলো এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামের ঘোষণা করলো। ২৬ জানুয়ারি লেংগুড়ায় কৃষকরা চৈতন্যনগরে জমিদারের কাচারি দখল করলো। তাদের সব কাগজপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হলো। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে কৃষকদের টংক ধান ও খাজনা না দেওয়ায় আহ্বান জানানো হলো। ১৮ জানুয়ারি কালিকাপুরে দুই গাড়ি টংক ধান আটক করা হলো। এই ধান আটকের নেতৃত্বে ছিলেন রমণী মানিক হাজং, কলাবতী হাজংসহ প্রায় ২০ জন আদিবাসী হাজং নারী।

জঙ্গি আন্দোলনের সময় কমিউনিস্ট পার্টি, হাজং ডালু প্রভৃতি আদিবাসীর মধ্য থেকে বাছাই করে জঙ্গিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেওয়া হয় সশস্ত্র সংগ্রামের শিক্ষা। এ সময় প্রশিক্ষিত জঙ্গিরাই সশস্ত্র শিবিরগুলোতে অবস্থান করত। জঙ্গিদের অস্ত্র ছিল–দেশি কামান, গাদা বন্দুক ও নিজেদের তৈরি বোমা। অস্ত্র তৈরির বিশেষজ্ঞ ছিলেন নালিতাবাড়ীর শচী রায়। একদিন অস্ত্র তৈরির সময় বিস্ফোরণে তিনি নিহত হন। অন্ধ হয়ে যান পূর্ণ হাজং নামে একজন। কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন চারণ কবি নিবারণ পণ্ডিত। এ সময় তিনি তার গানের স্কোয়াডসহ পাহাড় অঞ্চলে চলে যেতেন। গান গেয়ে প্রচার করতেন। পাহাড় অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের সময় কমিউনিস্ট পার্টির উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল নেত্রকোনা মহকুমার বালি গ্রাম। সেখান থেকে প্রায় সব জায়গায় যোগাযোগ রক্ষা করা হতো।

এ বিষয়ে মৌলবী আব্দুল হান্নান লিখেছেন– '... ... নিম্নাঞ্চলে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করা, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা, বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজ করা হতো নেত্রকোনায় বালিকে প্রধান

কর্মকেন্দ্র করে। পার্টির কাজের হাত চারদিকে ছড়ানো ছিল। বালি থেকে জেলা সদর, কিশোরগঞ্জ ও পাহাড় এলাকার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। তিন মুখে যোগাযোগের জন্য ভিন্ন লোক ছিল।... ...'

(আমার জীবনে কমিউনিস্ট পার্টী, পৃ. ৬৭)

সব দিক থেকে আন্দোলন জোড়দার হয়ে উঠলো। গারো পাহাড় অঞ্চলের কৃষকরা তাঁদের দাবিতে অবিচল। বিভিন্ন জায়গায় টংক ধান আটকসহ সর্বত্র এর প্রচার বাড়তে লাগলো।

১৯৪৯ সালের **৩১** জানুয়ারি রাশিমণি ও সুরেন্দ্রর শহিদ দিবস পালন করার জন্য ভোর হতেই কৃষকরা সুরেন্দ্রের সমাধিক্ষেত্রে মিলিত হলো। সেখানে অনুষ্ঠান শেষ করে তাঁরা ধোবাউড়ার ঘোষগাঁও হাটের দিকে রওনা হলো। হাটের দেড় মাইল দক্ষিণে ভালুকাপাড়া গির্জার সামনে একদল পুলিশ কৃষককর্মীর পথরোধ করল। তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে কলসিন্দুর পুলিশ ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যেতে চাইল। কৃষক নেতারা অনুরোধ করল গ্রেপ্তারকৃতদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কৃষক নেতারা বললেন, 'আজ আমরা কোনো বিরোধ করিতে আসি নাই, শান্তিপূর্ণভাবে শহিদ দিবস প্রচার করিতে আসিয়াছি।' কিন্তু পুলিশ তাদের কোনো অজুহাতই শুনল না। তারা জঙ্গি কৃষকদের নিরস্ত্র মনে করে বন্দুকের ভয় দেখাতে লাগলো। কোনো উপায় না দেখে জঙ্গিকর্মী অভিজ্ঞ নয়ন হাজং তাদের ভাষায় সবাইকে ঝাণ্ডা খুলে বর্শা ধরতে বললেন। তিনি খুব দ্রুত এক পুলিশের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে তার বুকেই বেয়নেট বসিয়ে দিলেন। কৃষককর্মীদের দুর্বার আক্রমণে পুলিশ দিশেহারা হয়ে গেল। নিহত হলো তিনজন পুলিশ। সেই দিনকার এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ধোবাউড়ার লাঙ্গলজোড়া গ্রামের খোকন হাজং (৮০)। তিনি জানান, তখন তিনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। লড়াইয়ের দিন তিনি ও তার এক মামা তাদের বাড়ি থেকে ঘোষগাঁও হাটে বাবার দোকানে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন, মানুষ আর মানুষ ও গোলাগুলির শব্দ। তারা ভয় পেয়ে ভালুকাপাড়া গির্জায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানে আরো অসংখ্যা মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশের আধুনিক অস্ত্র থাকলেও তারা কিছুতেই জঙ্গি কর্মীদের সাথে পেরে উঠতে পারছিল না। যে কারণে তিনি গির্জায় ফাদার কেউ পুলিশের প্রতি তাচ্ছিল্যের সাথে বলতে শুনেছেন, 'কী রকম পুলিশ এরা, পাঁচ-ছয়টা গুলি ছুড়ল, অথচ কারো শরীরে লাগলো না।'

ফাদার আরো বলছিলেন– 'Baheratoli was a drawn game, but

this one is defenitely a wining fight for the insurgents both from the point of loss of lives and arms.' [১১]

জানুয়ারির পর থেকেই সমগ্র পাহাড় অঞ্চল পরিণত হলো রণক্ষেত্রে। জঙ্গিরা ক্রমশই দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে হাজং কৃষকরা, যারা মৃত্যুকে পরোয়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর সংগ্রামে। কেননা পাকবাহিনীর অত্যাচারের মাত্রা তাদের ওপরই বেশি ছিল। সময়ের সাথে সাথে সুসং দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, নালিতাবাড়ী প্রভৃতি জায়গায় আদিবাসী গ্রামগুলো দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হলো। এসব এলাকায় পুলিশ কৃষকদের সামনে দাঁড়াতে সাহস পেত না। এ সময় সমগ্র পুলিশ ক্যাম্পগুলোতে জঙ্গি হামলার ভীতি দেখা দিয়েছিল।

১ ফেব্রুয়ারি কলসিন্দুর পুলিশ ক্যাম্পের পাশে নিতাই নদীর পাড়ে কৃষক কর্মীদের প্রচারের সময় পুলিশ ও আনসাররা তাদের অবরোধ করলো। কৃষককর্মীরা লড়াইয়ের জন্য পজিশন নিয়ে নিলো। এ অবস্থা দেখে পুলিশ আর অগ্রসর হলো না। তারা দূর থেকে গুলি ছুড়তে শুরু করলো। গোলার আঘাতে নিহত হলেন জাঙ্গালিয়াপাড়ার রামদয়াল ও রামচরণ নামে দুজন পথচারী। এই হত্যা কৃষকদের ক্ষোভ আরো বাড়িয়ে দিল। ৪ ফেব্রুয়ারি লেংগুড়ার হাটের দিন মঙ্গলচাঁদ সরকারের (যাবাং হাজং) নেতৃত্বে একদল জঙ্গি কৃষক বাহিনী প্রচারের জন্য বের হয়। তাদের সবার কোমরে ছিল দা, ভোজালি, হাতে লাল ঝাণ্ডা, পোস্টার, ড্রাম ও বিউগল। পুলিশের ক্যাম্প ছিল হাটের পাশেই। দুই দালান পুলিশ ক্যাম্পে খবর দিল যে, আন্দোলনকারী কৃষকরা ক্যাম্প আক্রমণ করবে। ফলে ক্যাম্পের পাশেই পরিখা ও ব্যাড়িকেডের ব্যবস্থা করে ১৫ জন পাঞ্জাবি পুলিশ প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সতর্ক অবস্থায় টহল দিতে থাকে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে হাট জমে উঠতে থাকলো। কৃষকবাহিনী হাটের উত্তর দিকে ঢুকেই সমস্বরে স্লোগান ধরলো , 'জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করো, জান দিব তবু ধান দিব না, ইনকিলাব জিন্দাবাদ... ...' ইত্যাদি। হাটের জমায়েত মানুষও তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলালো।

এমন সময় মঙ্গলচাঁদ সবার উদ্দেশে বললেন– 'ভাই সব! স্বাধীনতা লাভের পরও আমরা দুইশত বছরের মতোই পরাধীনতার জ্বালা-যন্ত্রণা, অত্যাচার, অবিচার ভোগ করিতেছি, আজও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হইলো না। শুধু তাহাই নহে, সাত বৎসর আগে আমরা যে জমিদারীর জুলুম গ্রাম হইতে দূর করিয়াছিলাম, আজ তাহাই আবার দেখা দিয়াছে। আবার নতুন করিয়া পুলিশ ক্যাম্প বসানো হইয়াছে। তাই আসুন আমরা আওয়াজ তুলি–জমিদারি প্রথার

অবসান হোক, গরিব চাষীর ধানে লেভি নাই, এলাকার উদ্বৃত্ত খাদ্য নগদ মূল্যে ক্রয় করো ইত্যাদি।' [১২]

পথসভা শেষ করে কৃষকবাহিনী হাটের অপর দিকে রওনা হলো। ক্যাম্পের পুলিশ তাদের দেখে ভয় পেয়ে গেল। পুলিশ কোনো ধরনের সংকেত না দিয়েই ২০/২২ গজ দূর থেকে কৃষককর্মীদের ওপর গুলি ছোড়া শুরু করল। কৃষকরা স্তম্ভিত হয়ে মাটিতে শুয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন। মঙ্গলচাঁদ তার সঙ্গীদের বললেন, 'ভাই সব! আজ আমাদের বিপ্লবীজীবনের কঠিন পরীক্ষা, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার একমাত্র উপায় শত্রুকে আক্রমণ করা। সুতরাং চল্, আমরা বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হই।' এই কথা বলে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে ক্যাম্পের দুয়ারে এগোতে থাকলেন। তার পেছনে অন্যরা। হামাগুড়ি দিয়ে মঙ্গলচাঁদ ক্যাম্পের দুয়ারে পৌঁছতেই পুলিশের অজস্র বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল তার দেহ। তিনি চিৎকার করে সাথীদের শত্রু হননের আহ্বান জানালেন। এরপরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বীর মঙ্গলচাঁদ সরকার (হাজং)। তার সাথী অগ্রেন্দ্র হাজং রক্তের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তিনিও পুলিশের বুলেটে শহিদ হলেন। বিদায়বেলায় সাথীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ো, লাল ঝাণ্ডা তুলে ধরো।' এদিকে অন্যান্য কৃষককর্মী পুলিশের অজস্র গুলিবর্ষণের ফলে মাথা তুলতে পারছিলেন না।

এ সময় খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা লেংগুড়া অঞ্চলে। পুলিশের গুলিতে দুজন হাজং যোদ্ধার শহিদের খবর পৌঁছার সাথে সাথে আপামর জনতা আদিবাসী হাজং নারী-পুরুষ যে যার মতো লাঠি, বর্শা, ফালা, রামদা ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে লেংগুড়ার পুলিশ ক্যাম্পের দিকে ছুটতে আরম্ভ করল। বিকাল ৩টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতা চারদিক থেকে ক্যাম্প ঘিরে ধরল। পুলিশের পালানোর কোনো পথ ছিল না। একপর্যায়ে ৩০-৪০ জনের একটি কৃষকবাহিনী ক্যাম্পের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো পুলিশের সাথে কৃষকদের রক্তক্ষয়ী লড়াই। পুলিশের আধুনিক অস্ত্রের সাথে বীরত্বের পরিচয় দিয়েও তাদের সাথে পেড়ে ওঠা ছিল দুষ্কর। তবু পিছু হটেননি। সত্যিকারের বীরের মতোই লড়ে গেছেন কৃষকরা। তাইতো হাজং বধূ শঙ্খমণি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েও তার স্বামীকে বলে উঠলেন, 'মোকে না চা, শত্রুকে মার, ওলা রক্ত লা।' অর্থাৎ আমার দিকে তাকাইও না, শত্রুকে মারো, ওদের রক্ত লও। পুলিশের সাথে প্রাণপণে লড়ে গেল সবাই। তারপর রাতের অন্ধকারে থামলো সে লড়াই। লড়াইয়ে তিনজন পুলিশ নিহত হলো। কৃষকদের মধ্যে শহিদ হলেন–শঙ্খমণি, রেবতী, সারথী, যোগেন, বাদকসহ প্রায় ১৯ জন হাজং যোদ্ধা। কিন্তু অনেকের নাম আজও আমাদের অজানা। নদী গণেশ্বরীই জানে সেদিনকার বীরদের সেই

আখ্যান, যেসব কৃষকের পবিত্র রক্তে ভিজেছে গণেশ্বরীর বুক। তার বালুচরেই ঠাঁই হয়েছে বিপ্লবী কৃষকদের সমাধি। এদিন হাজং প্রথম সারির নেতারা কেউ লেংগুড়ায় ছিলেন না। মণি সিংহও ছিলেন নেত্রকোনায়। খবর পেয়ে তিনি গেলেন লেংগুড়ায়। নেতাদের অনেকের মতেই পুলিশ ক্যাম্পে এভাবে আক্রমণ করা ঠিক হয়নি। কিন্তু এত কিছু ভাববার সময় হাজং কৃষকদের ছিল না। তাদের মনে ছিল শহিদের রক্তের প্রতিশোধ। হাজং কৃষকরা আবারও প্রমাণ করেছেন, তারা বীরের মতো লড়ে জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। যা-ই হোক, সব কিছু বিবেচনা করে মণি সিংহ বললেন, 'সরাসরি পুলিশকে আক্রমণ করা ঠিক হবে না। কাজেই অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। জঙ্গি ভলান্টিয়ার ওই সব স্থানে থাকবে।'

৪ ফেব্রুয়ারি লড়াইয়ের খবর ১৪ ফেব্রুয়ারির কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হলো এভাবে–

'দুর্গাপুর থানার এলাকাধীন লেঙ্গুড়া ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে গভর্নমেন্ট কর্তৃক ধান্য সংগ্রহ লইয়া কৃষক ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, সেই সম্পর্কে লেঙ্গুড়া হইতে আগত যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, পুলিশ ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে একশতাধিক কৃষক নিহত হইয়াছে। কৃষকদের অধিকাংশ হাজং... ...।'[১৩]

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার এক ইশতেহারে বলে– 'গত ২০শে জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার আংশিক শাসনবহির্ভূত অঞ্চলে হাজং চাষীদল সীমান্তরক্ষীদলের একজন নায়ককে হত্যা করে এবং একজন পুলিশ কনস্টেবলকে প্রহার করে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট দলভুক্ত হাজংদের এক বিরাট জনতা বর্শা, ও দা লইয়া লেঙ্গুড়ায় পুলিশ ক্যাম্প ঘেরাও করে। জনতা চলিয়া যাইতে অস্বীকার করাতে পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হয়... ...। গুলি বষর্ণের ফলে মোট ১৩ জন নিহত হয়। অবস্থা এক্ষণে সম্পূর্ণ আয়ত্তে।'[১৪]

ইশতেহারে সরকার আংশিকভাবে কৃষক হত্যার বিষয়টি স্বীকার করে। কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ ঘটনার খণ্ডিত অংশ।

লেংগুড়ায় হাজং কৃষকদের আত্মদান সমগ্র অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করলো। অন্যদিকে কৃষকদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সরকার সুসং দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে ২৫টি ক্যাম্পে পুলিশ ও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করলো।

১৯৪৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রচুর সিপাহি ও

আনসারসহ আন্দোলনকারীদের গোপন আস্তানা নালিতাবাড়ীর হলদি গ্রাম ঘিরে ফেললো। সেখানে অবস্থানরত সবাই টংক নেতাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাতের অন্ধকারেই আস্তানা ত্যাগের জন্য অগ্রসর হলেন। কিন্তু পুলিশের ব্যূহ ভেদ করতে গিয়ে পুলিশের সাথে জঙ্গিদের লড়াই শুরু হলো। এ সময় পুলিশকে সহায়তা করছিল স্থানীয় চৌকিদার। লড়াইয়ে অনেক নারীকর্মী পুরুষের ছদ্মবেশে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অন্যতম জলধর পালের স্ত্রী কণা পাল। আক্রমণ, পাল্টা-আক্রমণ–এমনভাবে লড়াই চললো প্রায় ভোর পর্যন্ত। উভয় পক্ষের আহত হলো অনেক। কমরেড রবি নিয়োগী, জলধর পালসহ অনেক নেতা-কর্মী আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হলেন। অবশ্য জিতেন মৈত্র ও কণা পাল কৌশলে পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন। এরপর সকালে পুলিশ হলদিবাড়ি গ্রামটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলো। তারা বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি ছুঁড়লো। সেখান থেকে আবারও গ্রেপ্তার করলো শতাধিক কৃষককে। তাদের ওপর চালালো নির্যাতন। ২৫ জনকে পাঠালো জেলে। মূলত লেংগুড়ার লড়াইয়ের পর থেকেই সরকারি বাহিনী কৃষকদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। সমগ্র অঞ্চল ঘিরে রাখলো প্রায় ১০০০ পুলিশ, আনসার দিয়ে। পুলিশ ক্যাম্পগুলো হয়ে উঠলো সাধারণ কৃষকদের অত্যাচারের আস্তানা। প্রতিদিন অসংখ্য কৃষককে এখানে ধরে এনে নির্যাতন করা হতো জঙ্গি কৃষক নেতা-কর্মীদের খোঁজ দেওয়ার জন্য। এ প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো কৃষকের নখের নিচে সুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হতো স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। অনেক জায়গায়ই পুলিশ কৃষককে নির্যাতন করেও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি।

সংগ্রাম যত এগোতে থাকে, কৃষকদের ওপর বীভৎস অত্যাচারের মাত্রা বাড়তেই থাকে। কিন্তু মুক্তিপাগল কৃষকরা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম থেকে পিছু হটবে না– এই তাদের প্রত্যয়। আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুনভাবে আরো কয়েকটি জঙ্গি ক্যাম্প স্থাপন করা হলো। খনন করা হলো পরিখা। আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির জন্য স্থাপন করা হলো ৩টি কারখানা। ব্যবস্থা করা হলো জঙ্গিকর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসার। এ ক্ষেত্রে ডা. অমিয় দাস বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কোনো কোনো জায়গায় আদিবাসী কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগেই তিন-চারটি ক্যাম্প স্থাপন করলো। আদিবাসী গ্রামগুলো এমনই সচেতন হয়ে উঠলো যে, কোথাও পুলিশের আক্রমণের আশঙ্কা করলে কৃষকরা বাঁশি, ঘণ্টা, শঙ্খ, খোল, করতাল ইত্যাদি বাজিয়ে সবাইকে সংকেত প্রদান করতো। এ কাজে রাখাল বালকরাও সাহায্য করছিলো। তারা কাপড় উড়িয়ে বা বাঁশি বাজিয়ে জঙ্গি কৃষকদের সতর্ক করতো।

১৯৪৯ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খারনৈ, হাতি পাগার প্রভৃতি

জায়গায় জঙ্গি কৃষকরা পুলিশ ক্যাম্পে আক্রমণ করে পুলিশকে নাজেহাল করে। জঙ্গীদের হামলায় নিহত হয় দুই জন আনসার। খিলাগড়ার মাঠে পুলিশের সাথে লড়াইয়ে শহিদ হন ভীম, বাদক, রহিম–এই তিন কৃষক। দুইজন পুলিশ আহত হয়। কুমারগাতি, ভুবনকুড়া, গোড়াগাঁওয়ে পুলিশের সাথে কৃষকদের সংঘর্ষ হলো। পুলিশ সেখান থেকে কয়েকজন কৃষককে আটক করে জেলে প্রেরণ করলো। কড়াইতলা গ্রামে সিপাহিদের সাথে গেরিলা যুদ্ধে শহিদ হলেন বীরযোদ্ধা সুদর্শন ও হরিসিং ডালু।

বেশ কিছু জায়গায় কৃষক জঙ্গিরা মহাজনদের খাজনা আদায় থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করলো। জঙ্গি ক্যাম্পগুলোতে মহাজন ও দালালদের বিচারের জন্য আদালত বসানো হতো। যেসব মহাজন কৃষকদের দাবি মানতো না, তাদের আদালতের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হতো। শাস্তির ব্যবস্থা ছিল দালালদের ক্ষেত্রেও।

প্রমথ গুপ্ত লিখেছেন– 'যেসব জমিদার মহাজন এই অঞ্চলের সংগ্রামী কৃষকদের দাবী মানিয়া লইয়াছে, তাহাদের সকলেই এভাবে বিদ্রোহী কৃষকদের নিকট হইতে রেহাই পাইয়াছে। কিন্তু দালালদের রেহাই দেওয়া হয় নাই। ঘিলাভুঁইয়ের বঙ্কু বিহারী, কালিকাপুরের নীরোদ, কাংসার ধমক চৌকিদার, চারুয়াপাড়ার স্কুলের শিক্ষক নলিনী, ঘোষগাঁওয়ের ট্যাক্স আদায়কারী পিটার গারোসহ ৩০ জনকে গণ-আদালতে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হালাল করা হইয়াছে। বিক্রী কুড়ার জোতদার শিয়ালু মুণ্ডকে হত্যা করিয়া তাহার বন্দুক ও অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা হইয়াছে। এইভাবে বন্দুক দখল করা হইয়াছিল ২৫টি; কিন্তু সঙ্কট ছিল কার্তুজের। মায়াকাশী, রামচন্দ্র কুড়া, খারনৈ গ্রামের দালালদের বাড়ি লুট করিয়া আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।'

(যে সংগ্রামের শেষ নেই, পৃ. ১২৯)

টংক আন্দোলনের এ পর্যায়ে সিলেট জেলাও যোগদান করে। সেখানে নেতৃত্ব দেন রবি দাম। তাঁর নেতৃত্বেই জঙ্গি কৃষক বাহিনী পাহাড় অঞ্চলে নিরাপদ আস্তানা তৈরি করে। তৎকালীন সুনামগঞ্জ মহকুমার লাউতাবাহাদুরপুর, বিশরপাশা থানা এবং মোহনপুর, বড়ছাড়া, বংশীকুড়া, নাউর, রাধানগর প্রভৃতি গ্রামের কৃষকরা মুক্তির প্রত্যয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁরা জমিদার, মহাজনদের ধান দেওয়া বন্ধ করে দেন। সংগঠিত কর্মীরা এসব ধানগুলো সংগ্রহ করে দরিদ্র কৃষকদের বিলীয়ে দিতেন। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে মোহনপুর গ্রামে ধান বিতরণের সময় পুলিশ ও কৃষককর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে

রবি দামসহ আরো একজন কৃষক শহিদ হন। রবি দামের স্ত্রী অনিমা দাম এ সময় এ লড়াইয়ে ছিলেন।

সময়ের সাথে সাথে সমগ্র টংক অঞ্চল পরিণত হলো রণক্ষেত্রে। প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও লড়াই ঘটেই চলেছে। অনেক জায়গাতেই পুলিশ বিপর্যস্ত হলো জঙ্গি কৃষক নেতা-কর্মীদের আক্রমণে। এ অবস্থায় পাক সরকার নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে সমগ্র এলাকায় বিপুলসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করলো। তারা দীর্ঘ ৯০ মাইল এলাকায় নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করলো নিরস্ত্র জনগণের ওপর। পাক সেনাদের বর্বর আক্রমণের শিকার হলো কলমাকান্দার জাগীরপাড়া গ্রাম। ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হলেন আদিবাসী সংগঠক ও কর্মীরা। এরা হলেন–গিরীন্দ্র, যতীন্দ্র, হরেন্দ্র, মহেশ্বর, কৃত্তিবাসসহ প্রায় ৪০ জন।

এ হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে প্রমথ গুপ্ত লিখেছেন– 'কলমাকান্দা থানার জাগীরপাড়া গ্রামটি এক গভীর রাতে ৫০০ সিপাহি পুলিশ-আনসার ঘিরিয়া ফেলিয়া আক্রমণ করিল। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে ৪০ জন ঘুমন্ত চাষীকে নির্বিচারে হত্যা করিল। কৃষকরা প্রতিরোধ বা পলায়নের সুযোগ পর্যন্ত পাইল না। এমন জঘন্য হত্যাকাণ্ড যেকোনো দেশের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসেই বিরল।'

(যে সংগ্রামের শেষ নেই, পৃ. ১৩০)

দিন দিন অধিকার আদায়ের জন্য কৃষকরা আত্মত্যাগ করেই চলেছেন। কৃষকদের বেশির ভাগই হাজং। সব কৃষক আত্মপ্রত্যয়ে তখনো দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এ অবস্থায় পাহাড় অঞ্চলে গেরিলা বাহিনীর অবস্থান আরো শক্তিশালী করার জন্য রাণীপুরের চিরাখালীতে জঙ্গি কৃষককর্মীদের একটি গ্রাম তৈরি করা হলো। গ্রামটি ছিল আসামের গারো পাহাড়ের পাদদেশে। এখানে কৃষকদের জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হলো। নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করা হলো সার্বক্ষণিক পাহারার। গ্রামটিতে লাল পতাকা উড়তো সারাক্ষণ। একদিন রাণীপুরের খোলা মাঠে পুলিশের সাথে জঙ্গি কৃষককর্মীদের ভয়ানক লড়াই বাধলো। সেদিন পুলিশ কয়েকটি গ্রাম লুট করে ফেরার পথে চিরাখালী গ্রামে জঙ্গি ক্যাম্প উদ্দেশ্য করে প্রচুর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করলো। এ সময়ে ২০ জন জঙ্গি তাদের প্রতিরোধের জন্য রাণীপুরের খোলা মাঠে চলে গেলো। তাঁরা কোনো ভাবনা-চিন্তা না করেই খোলা মাঠে নেমে পড়লো। জঙ্গিদের সাহায্যের

জন্য আরেকটি দলও যোগ দিল তাদের সাথে। কিন্তু পুলিশের অবিরত গুলিবর্ষণে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতেই পাড়ছিলো না। জঙ্গিদের ছিল মাত্র একটি বন্দুক আর কিছু হাতবোমা। তা দিয়েই তারা পুলিশের সাথে এক ঘণ্টা লড়াই করলো। এরপর তাদের হাতবোমা শেষ হয়ে আসায় তারা তীর, বর্শা, দায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। জঙ্গিদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হলো চার-পাঁচজন সিপাহি। অনন্ত ও চন্দ্রের আক্রমণে নিহত হলো একজন পুলিশ। কিন্তু পুলিশের আধুনিক অস্ত্রের জন্য প্রাণ দিতে হলো বীর কৃষক যোদ্ধাদের। ভয়ঙ্কর এ লড়াইয়ে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে শহিদ হলেন– দুবরাজ, ক্ষীরোদ, অনন্ত, চন্দ্র, নরেন্দ্র হাজংসহ মোট ৯ জন বীর হাজং যোদ্ধা। পুলিশ নিহত হলো তিনজন। রাণীপুর লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করে দিলীপ চক্রবর্তী লিখেছেন–

'আমার মামা শশীন চক্রবর্তীর চোখে আমি কখনও জল দেখেছি বলে মনে হয় না। কিন্তু ১৯৬৬ সালে সাপ্তাহিক কালান্তরে লেখার জন্য আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন একটি ঘটনার কথা বলতে গিয়ে তিনি হঠাৎ তাঁর চোখের জল ফেলেছিলেন। রাণীপুরে যে ১২ জন হাজং–ডালু মারা গিয়েছেন, তাঁদের মৃতদেহ লাল শালুতে ঢেকে এনে কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাসেবকরা এঁদের বীরের সম্মান জানিয়েছিলেন। এই ১২ জনের মধ্যে ছিল চন্দ্র আর অনন্ত। আপন দুই ভাই। বৃদ্ধা-বিধবা মা পাকুড়ির দুই ছেলে। মা-ও এসেছিলেন তাঁদের বিদায় জানাতে। বৃদ্ধা শোকে পাথর হয়ে ছেলেদের দেহে হাত বুলিয়েছিলেন, যেন সন্তানদের ব্যথা বুঝতে চান। এরপর ওই দুই হাতেই ছেলেদের বুকে ফুল দিয়েছিলেন। যুবক নরেন্দ্র হাজংও মারা গিয়েছিলেন এই লড়াইয়ে। তাঁর যুবতী স্ত্রী পাহাড় থেকে কিছু লাল ফুল এনেছিল, সে চিৎকার করে কাঁদেনি। কিন্তু স্বামীর বুকে যখন সে ফুল দিয়েছিল, তা ছিল আক্ষরিক অর্থেই চোখের জলে ভেজা।'

(গারো পাহাড়ের লাল ফুল, পৃ. ২২)

রাণীপুর লড়াইয়ের সময় মণি সিংহ সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি নিরাপদ ক্যাম্পে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি শহিদ হাজংদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে গেলেন। আপনজনদের হারিয়ে শহিদদের মা, স্ত্রী যে কতটুকু ধৈর্যশীল ছিলেন, প্রতিশোধের নেশায় টগবগ করছিলেন, তার বর্ণনা দিয়ে মণি সিংহ লিখেছেন–

'কিছুদূর যেতেই একজনের সাথে দেখা হলো। আমি আশ্চর্য হ'লাম যে সে কাঁদছে না। মুখ গম্ভীর। আমি তাকে কয়েকটি কথা বললাম, সে কোনো কথা বলল না। সামনে কতগুলো বল্লম ছিল, সে দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের ভাব,

এই রক্তের অবশ্যই বদলা নেব। শত্রুদের কঠিন আঘাত হানতে হবে। একটু পরে দেখলাম, তাঁর চক্ষু হতে জল ঝরে পড়ছে। যাদের কাছে গিয়েছি, কেউই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদেনি। একজন মাকে দেখলাম–গুন গুন করে কাঁদছে। এদের ধৈর্য দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আজও মারা যায়নি। যদি মরত, তবে আমি সেই অবস্থায় কী করতাম জানি না। এই সব নিরক্ষর মেয়ে আমাকে যতেষ্ট শিক্ষা দিল। আমরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত আছি– এই স্পর্ধা এই নিরক্ষর মেয়েদের সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও ধৈর্যের কাছে খান খান হয়ে গেল। কতভাবে এরা প্রস্তুত রয়েছে–এটাই ছিল অনুধাবনের বিষয়। সংগ্রামের পূর্বে আমরা দৃঢ় সংকল্প প্রচার করেছিলাম যে আমাদের অনেকের মৃত্যু হতে পারে; আমাদের ঘরবাড়ি ভাঙা হতে পারে; কিন্তু আমরা সংগ্রামে অটল থাকব। যত দিন পর্যন্ত টংক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ না হয়, সংগ্রাম চালিয়ে যাব। পিছু হটব না।'

(জীবন সংগ্রাম, পৃ. ১০৫)

লড়াইয়ের কয়েক দিন পরই পাক বাহিনী চিরাখালী ক্যাম্প ও আশপাশের গ্রামগুলো তাদের আয়ত্তে আনলো। গ্রামবাসীর ওপর চালালো নির্যাতন। লুট করলো কৃষকদের জিনিসপত্র। গ্রেপ্তার করলো ৫০ জন কৃষককে। পুলিশের অত্যাচারে ৭ জন কৃষক ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করলো। সে সময় দুর্গম পাহাড় অঞ্চলের লড়াইয়ের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো খুবই কম। তবু কিছু কিছু খবর প্রকাশিত হতো কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে মূল্যবান কিছু কাগজপত্রসহ লড়াইয়ের সংবাদ পৌঁছাতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন মণীন্দ্র কর নামের একজন কুরিয়ার। পুলিশ নির্দয়ভাবে ফাঁকা মাঠে তাকে গুলি করে হত্যা করলো। সংবাদ পৌঁছাতে গিয়ে আরো গ্রেপ্তার হলেন অশ্বমণি হাজং, ভদ্রমণি হাজং, রহেলা হাজং। পুলিশ তাদের ওপর নির্যাতন চলালো। তাদের দীর্ঘদিন জেলে আটক রাখা হলো।

চারদিকে কৃষকদের রক্ত আর রক্তের বদলায় অগ্রসর হচ্ছিল আন্দোলন। ১৯৫০ সালের ৩১ জানুয়ারি রাশিমণি ও সুরেন্দ্রের শহিদ দিবস পালন করার জন্য চান্দুভুঁই গ্রামের মাঠে ১৫০০ জন কৃষক জমায়েত হলো। এত মানুষের সমাবেশ দেখে পুলিশ ভয়ে সভার দিকে অগ্রসর হলো না। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভা শুরু হয়ে চললো প্রায় ২ ঘণ্টা। এখানে সর্বোসম্মতিক্রমে টংক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নালিতাবাড়ীর রংটিয়া পাহাড়ে পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর সাথে জঙ্গি কৃষকদের লড়াই হলো। মাত্র ১০ জন যোদ্ধা

২০০ জন সিপাহির সাথে বীরত্বের সাথে লড়ে গেলো। লড়াইয়ে গুরুতর আহত হলো বীরযোদ্ধা কালিয়া কিশোর। বীর যুগেন্দ্র হাজং সিপাহিদের গুলিতে নিহত হলেন। লড়াইয়ে কৃষকরা পরাজিত হলো। এতে পাক সিপাহিরা কৃষকদের আস্তানাটি দখল করে নেয়।

ফেব্রুয়ারি মাসেই জঙ্গিরা বগাউড়া পাহাড় থেকে বোমা ফেলে সিপাহিদের একটি ট্রাক বিধ্বস্ত করেন। এতে ৮/১০ জন সিপাহি জখম হয়। এরপর সুসংয়ের ভবানীপুরে জঙ্গিদের চোরাগোপ্তা আক্রমণে নিহত হলো দুজন সিপাহি।

এভাবে একদিকে সমগ্র কৃষকরা লড়ে যাচ্ছিল তাদের অধিকার আদায়ের জন্য, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী মুসলমান কৃষকদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করছিল আন্দোলন হতে সরে যেতে। মণি সিংহ লিখেছেন–

"... ... সংগ্রাম দেখে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে এক ভীতির সঞ্চার হলো। সরকার ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল পাণ্ডরা বোঝালো–টংক দিতে হয় না, লেভিও দিতে হয় না, এটা তো খুব ভালো; কিন্তু এই আন্দোলনে পাকিস্তানও ভেঙে যেতে পারে। তারা এই চিন্তায় বিমর্ষ-দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের কাছে এ খবর এসে পৌঁছল। আমরা চিন্তিত হলাম। মুসলমান কৃষকরা টংক ধান দিচ্ছিলেন ঠিকই; কিন্তু তাঁরা হাজংদের মতো জঙ্গি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছিলেন না।'

(জীবনসংগ্রাম, পৃ. ১০৯)

এ অবস্থায় ১৯৫০ সালের প্রারম্ভে কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর মুখপত্র– 'ফর লাস্টিং পিস অ্যান্ড পিপলস্ ডেমোক্রেসি'র সম্পাদকীয়তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের নীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়–

'১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্রিটিশ পুঁজির ও ভারতের ভূমিব্যবস্থায় সামন্তবাদের শোষণ বিদ্যমান ছিল। তাই ভারতের কমিউনিস্টদের কর্তব্য ছিল–সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের ওই শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য সংগ্রাম করা এবং সে সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ এবং তাদের সহযোগী প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিক, ধনী কৃষকসহ সমস্ত কৃষকসমাজ, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্মিলিত মোর্চা গঠন। ভারতের বিপ্লবের স্তর ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্তবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর ইত্যাদি।' [১৫]

সম্পাদকীয় প্রকাশের সাথে সাথেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে

সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কলকাতার কংগ্রেসে গৃহীত বি. টি. রনদীভের থিসিসের ওপর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ সভ্যরা। সে সময় কার সিদ্ধান্তে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একাকার হয়ে গিয়েছিল। ফলে সম্পাদকীয় প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ সময় টংক আন্দোলনকারীদের জঙ্গি হামলায় সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের দুর্ধর্ষ আক্রমণ ও ব্যাপক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার পুলিশের মাঝে ক্রমাগত ভয়ের জন্ম দিচ্ছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সুসং দুর্গাপুরের স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় টংক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা করলেন, তার বক্তব্য ছিল এ রকম– 'টংক উঠিয়ে দিচ্ছি; সবাই জমির স্বত্ব পাবে, জমিদারি প্রথাও আইন করে তুলে দিচ্ছি, রাস্তা দিয়েছি; স্কুল দিয়েছি, কাজেই তোমরা এখন আন্দোলন থামিয়ে দাও।'[১৬]

নূরুল আমীনের বক্তব্য ও 'ফর লাস্টিং পিস অ্যান্ড পিপলস্ ডেমোক্রেসি'র সম্পাদকীয়ের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনকারী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা জেলা কমিটির মিটিং ডেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন।

হাজং অঞ্চলে সরকারের বর্বরতা

আন্দোলন প্রত্যাহারের পর নূরুল আমীনের চক্রান্তে পাক বাহিনী হাজং অঞ্চলে শুরু করে নারকীয় অত্যাচার। তারা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। বাড়িঘর লুট করে। হত্যা করে নিরীহ হাজং কৃষকদের। নারীদের ওপর চালায় পাশবিক অত্যাচার। এ দমননীতি ছিল অন্য অত্যাচারগুলো থেকে সবচেয়ে বীভৎস। এ সময় সরকার ত্রাসের রাজ্য কায়েম করলো কলমাকান্দা থেকে শ্রীবর্দী পর্যন্ত। আদিবাসী হাজং কৃষকদের বাধ্য করা হলো সীমান্তের ওপারে চলে যেতে। তাদের বাড়িঘরগুলোতে বিভিন্ন জেলা থেকে মুসলমান কৃষকদের এনে বসানো হলো। এমনকি সুসং দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা সীমান্তের প্রতিটি গ্রামে বিহারি মহাজনদের বসিয়ে দেওয়া হলো। সে সময়র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উদ্বাস্তু আসামের মুসলমানদের ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় দিয়ে পাক সরকার মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়েছিল, সে বিষয়ে কেনো সন্দেহ নেই। এদেশীয় হাজংরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা বিবেচনা না করে ওই সব উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেওয়াই ছিল তখনকার সরকারি কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ। সরকারি কর্মকর্তাদের এ রকম দায়িত্ববোধের পরিচয় আমরা পাই তখনকার সরকারি কর্মকর্তা খালেকদাদ চৌধুরীর লেখায়। তিনি লিখেছেন–

'সেখানকার জমিদারদের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে সার্কেল অফিসারের অফিস ও বাসস্থান স্থাপন করা হয়েছে। মহকুমা প্রশাসকও সেখানেই আছেন। সেখানে সরকারি যাবতীয় কাজকর্ম চলছে। আসাম প্রত্যাগত বাস্তুহারাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং হাজংদের অতর্কিত আক্রমণ ও লুটতরাজ বন্ধ করাই ছিল তখনকার প্রধান সরকারি কাজ।'

(শতাব্দীর দুই দিগন্ত, পৃ. ৮৮)

এই সরকারি কর্মকর্তা তখনকার দায়িত্বের অংশ হিসেবে তাঁর এক দিনের কাজের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, "... ... সে রাতেই আমাকে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে জনানো হয়। বলা হয়, পরদিন ছটি মোষের গাড়ি বোঝাই ধান কলমাকান্দার বিভিন্ন পুলিশ ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে হবে। ... ... সেখানে আগত রিফিউজিদের মধ্যে তা বণ্টন করতে হবে বীজধান হিসেবে। তাদের বসবাসের

জন্য গ্রামের পরিত্যক্ত বাড়ি ও চাষের জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। আরও বলা হয় যে, সেখানকার পঞ্চায়েতের বাড়িতে একশত সাতটি গরু-মহিষ ধরে রাখা হয়েছে, সেগুলো জোনাল অফিসারের নিকট হতে বুঝে নিয়ে যেসব রিফিউজির বাসস্থান নির্ধারিত হবে, তাদের এক জোড়া করে দিতে হবে।'

(শতাব্দীর দুই দিগন্ত, পৃ. ৯১)

খালেকদাদ চৌধুরী তাঁর লেখায় হাজংদের বিদ্রোহী ও লুটতরাজকারী বলেছেন। যেটি হাজংদের প্রতি সরকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। পাক সরকার আসামের বা আসাম ফেরত মুসলমানদের যেভাবেই বলি না কেন, তাঁদের আশ্রয় দিয়ে মানবিক কাজ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই মুসলমানদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এত পরিত্যক্ত বাড়ি ও রিফিউজিদের মাঝে বণ্টনের জন্য ধান বা গরু-মহিষগুলো কোথা থেকে আসলো। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই এটা জানার জন্য আমাকে খুব বেশি তথ্য ঘাঁটতে হয়নি। খালেকদাদ চৌধুরীর বই থেকেই জানতে পারি, সেই দিনকার যে গরু-মহিষগুলো রিফিউজিদের মাঝে বণ্টন করার দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়েছিল, সেগুলো আসলে হাজংদের। যা গ্রামের পঞ্চায়েত কর্তৃক ধোঁকা দিয়ে হাজংদের কাছ থেকে লুট করা হয়েছে। যেগুলো পরে সরকারের নির্দেশে রিফিউজিদের দেওয়া হয়েছিল। এই পঞ্চায়েত ছিল পাক সরকারের একান্ত সহযোগী। বিভিন্ন বই এবং টংক আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে এমন অসংখ্য ঘটনা আমারা জানতে পারি। সাম্প্রদায়িক পাক সরকার হাজংদের এ দেশ থেকে বিতারিত করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। তাঁদের ধান-চাল, গরু-মহিষ লুট করে তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িতেই মুসলমানদের পুনর্বাসন করা হয়েছে।

হাজংদের উচ্ছেদপ্রক্রিয়ায় সরকার সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করলো। অনেক জায়গায় পাক সৈন্যরা উচ্ছেদের জন্য ব্যবহার করলো ৮-১০টি হাতি। পাঁচগাঁও, খারনৈ, চৈতন্যনগর, লেংগুড়া, জিগাতলা, ভেদীকুড়া, মাইজপাড়া, ঘোষগাঁও, গাজীর ভিটা, হালুয়াঘাট, ভুবনকুড়া প্রভৃতি স্থানে দেড়শতাধিক গ্রাম থেকে হাজংদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করা হলো। বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হলো শত শত হাজং নারী-পুরুষকে। তাদের ময়মনসিংহ জেলে প্রেরণ করা হলো। সেখানে নির্যাতনের ফলে ২৫ জন নিহত হয়। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলো অনেকেই। কমরেড ললিত সরকারের (হাজং) মতো ত্যাগী নেতাকেও ভারতে চলে যেতে বাধ্য করা হলো।

হাজং অঞ্চলে অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে সে সময় ভারতের মেঘালয় থেকে

ললিত সরকার (হাজং) ও বিপিন গুণ (হাজং) কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সাহায্য চেয়ে কমরেড শশীন চক্রবর্তীর কাছে একটি চিঠি দেন। তা উল্লেখ করে দিলীপ চক্রবর্তী লিখেছেন–

'একদিন ললিত সরকার আর জয়গোপাল ওরফে বিপিন গুণের যুগ্ম স্বাক্ষরে এলো একটি চিঠি লালগড়ে আমাদের বাড়িতে, আমার মামা শশীন চক্রবর্তীর নামে। ... ... ওই চিঠিতেই তারা তথ্য দিয়ে বলেছিলেন, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভা প্রভাবাধীন আদিবাসী অঞ্চলে পাক বাহিনী আর তাদের মদদস্পুষ্ট গুণ্ডারা আক্রমণ ও সন্ত্রাস চালায়। এদের আক্রমণে ওই সময় পর্যন্ত ১০৩ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় পাঁচশত নর-নারী। বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন ১০ হাজার মানুষ। ৫০০ জন নারীসহ কারারুদ্ধ হয়েছেন ৫০০০ জন। দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ৮০ জনকে। জেলে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। অনাহারে মৃত্যু হয়েছে ১৫০০ জনের। আগুনে পোড়ানো হয়েছে ৪৫০টি বাড়ি, নষ্ট করা হয়েছে ৪৩০০ ঘর, জমি বাজেয়াপ্ত ও জবরদখল হয়েছে ৭০টি গ্রামের। পাইকারি জরিমানা হয়েছে তিন লাখ টাকা। পাক বাহিনীর হাতে আটজন আদিবাসী রমণী নিহত হয়েছেন, গ্রেপ্তার হয়েছে ৫০০ জন। এ ছাড়া বহু আদিবাসী রমণী নিখোঁজ, অনেক রমণীর সম্ভ্রমহানি হয়েছে।'

(গারো পাহাড়ের লাল ফুল, পৃ. ৩০)

এই চিঠি পাওয়ার পর তৎকালীন কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টি 'হাজং রিলিফ ফান্ড' গঠনের মাধ্যমে কিছু টাকা তুলে হাজং অঞ্চলে পাঠায়। যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য।

এ সময় টংক আন্দোলনের বেশ কিছু কমিউনিস্ট নেতাকর্মী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। অনেকেই জেল থেকে মুক্তি লাভের পর ভারতে চলে যান। ফলে হাজং কৃষকরা এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাচ্ছিলেন না। মূল কথা, টংক আন্দোলনের অপরাধে এবং পাক সরকারের সাম্প্রদায়িক মনোভাবে দমননীতির ফলে হাজংরা ঘরবাড়ি হারিয়ে একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এমনকি পরবর্তী সময় পর্যন্ত তাদের পাক সরকারের হিংস্রতা সইতে হয়েছে। ত্যাগ করতে হয়েছে দেশ। সে সময়কার সরকারের হিংস্রতার ফল হাজংদের বংশপরম্পরায় বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছে। টংক আন্দোলনে হাজংদের সার্বিক দিক দিয়ে ক্ষতির রেশ এই প্রজন্মকেও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

আন্দোলনের কিছু বিতর্কিত বিষয় পর্যালোচনা

আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে আমাকে হাজং সম্প্রদায়ের বিভিন্নজনের সাথে কথা বলতে হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ধোবাউড়ার একজন হাজং স্কুলশিক্ষক আন্দোলনে হাজংদের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন–

'সে সময় হাজংদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল অশিক্ষিত, রাজনীতির কোনো ধারণাই ছিল না। আমি মনে করি, কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণরূপে হাজংদের ব্যবহার করেছে।'

তাঁর এই কথাটি যে একবারেই সত্য তা বলা যাবে না। কেননা আন্দোলনটির সূত্রপাত কৃষকদের প্রয়োজনেই হয়েছিল। তবে সশস্ত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্তে দেখা যায়, কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণরূপে হাজংদের তাঁদের জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করেছে। তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা কমরেড খোকা রায় ১৯৮৮ সালের নভেম্বরে কমরেড ক্ষীতিশ চক্রবর্তীর স্মরণে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যা একতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। খোকা রায়ের এই লেখায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে তিনি লিখেছেন–

'১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের গৃহীত রাজনৈতিক থিসিসের ফলে ভারত ও পাকিস্তান এই উভয় দেশের পার্টির ভেতর এক গভীর সঙ্কীর্ণতাবাদী ও হটকারী বিচ্যুতি ঘটেছিল। তার প্রভাবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্ব ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের পরে, পার্টির সাংগঠনিক দুর্বলতা, মুসলমান জনগণ থেকে পার্টির বিচ্ছিন্নতা, তাদের মনোভাব প্রভৃতি বিচার না করেই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফ্রন্টে জঙ্গি সংগ্রাম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ময়মনসিংহের জেলা পার্টিও বিভিন্ন ফ্রন্টে বিশেষত হাজং এলাকায় আবার টংকবিরোধী জঙ্গি সংগ্রাম গড়ার উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের প্রারম্ভে হাজং এলাকার একটি গ্রামে সভা করে। ওই সভায় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক হিসেবে আমি উপস্থিত ছিলাম। ... ... পার্টির প্রাদেশিক কমিটির নীতি ও জেলা কমিটির অধিকাংশের মতে, হাজং এলাকায় আবার টংকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ... ... ।'[১৭]

টংক আন্দোলনে হাজং কৃষক ও অন্যান্য কৃষকের বীরত্বপূর্ণ অবদান অবশ্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এ আন্দোলনের সফলতা সার্বিক অর্থে প্রশ্নবিদ্ধ। সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার পেছনে নেতৃবৃন্দের ভুলই দায়ী। টংক আন্দোলনসহ তখনকার পূর্ব বাংলার অন্য কৃষক আন্দোলনের ব্যর্থতা উল্লেখ করে বদরুদ্দীন উমর নিম্নোক্ত কারণগুলোকে দায়ী করেছেন–

১. পাকিস্তান উৎখাতের স্লোগানকে জনগণ গ্রহণ করেনি এবং সে পর্যায়ে গ্রহণ করার কথাও নয়। এ বাস্তবতা না বুঝে কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তান উৎখাতে স্লোগান দেয়। ফলে সরকার খুব সহজে তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়।

২. সরকারের সাথে সীমাবদ্ধ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে যারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করে আসছিল, তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হঠাৎ করে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেওয়াতে তা গণবিচ্ছিন্নতা নিয়েই শুরু হয় এবং প্রতিদিন তা প্রকটতর হয়।

৩. নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির কাঠামোতে গড়ে ওঠা সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে এই ডাক দেওয়ার ফলে অনেক কর্মী দল ত্যাগ করে এবং বিপুলসংখ্যক কর্মী দেশ ত্যাগ করে। ফলে ১৯৪৮ সালের মধ্যে গোটা পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো একেবারে চুরমার হয়ে যায়।

৪. তৎকালীন কৃষক আন্দোলনগুলো প্রধানত হিন্দুপ্রধান এলাকায় হওয়ায় সরকার বিপ্লবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাকে মোক্ষমভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল।

৫. 'গণ-আন্দোলনের সর্বোচ্চ স্তর সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান'–এই ভাবে না ভেবে, ভ্রান্তভাবে স্বল্প এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলে গণ-অভ্যুত্থান ঘটানোর ভুল রণকৌশল তাদের সন্ত্রাসবাদী কানাগলির মাঝে আবদ্ধ করে ফেলে। ফলে খুব দ্রুতই সীমিত এলাকাগুলো থেকেও তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হয়।

৬. কতগুলো এলাকায় সংগ্রাম গড়ে তুলতে গিয়ে দেশব্যাপী সাধারণ কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের জন্য সাধারণ কোনো ডাক দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, ফলে এই সব আঞ্চলিক আন্দোলনের আবেদন সমগ্র জনগণের কাছে ছিল খুবই সীমিত।[১৮]

টংক আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া নিয়েও হাজংদের মধ্যে এখনো যথেষ্ট বিতর্ক বিদ্যমান, যা একেবারেই স্বাভাবিক। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এ রকম একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক হাজং যুবকের কথা উল্লেখ করে

অধ্যাপক যতীন সরকার লিখেছেন–

"মহেশখোলায় নিশি মাস্টারকে আমি প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। এই হাজং যুবক বলেছিলেন, 'হাজংরা তো আন্দোলন থেকে হটে আসেনি। তারা চরম আত্মত্যাগ করেছে। ... ... কিন্তু আন্দোলনের নেতারাই আন্দোলন তুঙ্গে উঠে যাওয়ার পর একসময় বললেন যে আন্দোলনে অনেক ভুল হয়ে গেছে, এবং সেই নেতারাই হঠাৎ করে আন্দোলনটি বন্ধ করে দিলেন।'

নিশি মাস্টারের কথাও হয়তো পুরো সত্য নয়। তার নিজস্ব স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কথাগুলো বলেননি। কারণ টংক আন্দোলনের সময় তার বয়স খুব বেশি ছিল না, আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ তিনি করতে পারেননি। তবে আন্দোলন-পরবর্তীকালের হাজংদের দুর্দশার তিনি অংশীদার।"

(পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু-দর্শন, পৃ. ৪২৩)

টংক আন্দোলনে হাজং কৃষকরা চরম আত্মত্যাগ করেছে, এ বিষয়ে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সময়ে এসেও আমি হাজং সম্প্রদায়ের যেসব মানুষের সাথে কথা বলেছি, তাঁদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন, কমিউনিস্ট পার্টি শুধু পার্টির ইচ্ছা অনুযায়ীই আন্দোলনটি থামিয়ে দিয়েছে। এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পর পার্টি হাজং কৃষকদের যতটুকু প্রয়োজন ছিল সে সহায়তা করেনি। এসব ক্ষোভ তাদের কথায় স্পষ্টভাবে লক্ষ করেছি। যা-ই হোক, এর পক্ষে-বিপক্ষে এ রকম অসংখ্য যুক্তি-তর্ক আমরা পেতে পারি। তবে জঙ্গি আন্দোলন যে কমিউনিস্ট পার্টির ভুল ছিল এবং কেন তা থামিয়ে দেওয়া হলো, তার কারণ উল্লেখ করে মণি সিংহ লিখেছেন–

"অতীব দুঃখের কথা, বামপন্থী হঠকারিতার ফলে বারো বছরের একটি নিবিড় নিশ্ছিদ্র জমাট বাঁধা জঙ্গি ও সুশৃঙ্খল সংগঠন ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আন্দোলন করা আমাদের ঠিকই ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি না বুঝে সশস্ত্র সংগ্রাম করা বামপন্থী বিচ্যুতি।

আমাদের সংগ্রাম ছিল সামন্তবাদী টংক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রাম। ওটা নূরুল আমিন সরকারকে উচ্ছেদের সংগ্রাম ছিল না। এটা মনে রেখে এবং শুধু একটি এলাকায় নয়, সমগ্র দেশবাসীর মনোভাব বিচার করে আমাদের কৌশল নির্ধারণ করা উচিত ছিল। তা না করায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে, তারা পাকিস্তান ভেঙে ফেলতে চায়–এই কথা বলে সরকার দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেয়েছিল। ফলে পার্টি ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমরা যখন এটা উপলব্ধি করতে পারলাম, তখন

আন্দোলন থামিয়ে দিলাম। এর ফলে যে মারাত্মক দমননীতি নেমে আসে, তাতে ক্ষতি হয় ঠিকই; কিন্তু আন্দোলন চালিয়ে গেলে সেই অবস্থায় আরো ক্ষতি হতো। সরকার তখন জমিদারি প্রথা ও টংক প্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন। সে অবস্থায় আন্দোলন চালিয়ে যাবার আর যুক্তিও ছিল না।"

(জীবনসংগ্রাম, পৃ. ১১০, ১১১)

এখন কথা হচ্ছে, টংক আন্দোলন কি কমিউনিস্ট আন্দোলন? হাজং কৃষক আন্দোলন? নাকি কৃষক আন্দোলন?

এ রকম বিতর্ক অনেক সময়ই দেখা যায়। যে যার অবস্থান থেকে আন্দোলনটিকে তাঁর মতো করে নেন বা নিতে পারেন। আন্দোলনটি আসলে কী, সে ক্ষেত্রে আমি আন্দোলনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

১৯৩৭ সালে মণি সিংহ কৃষকদের অনুরোধে আন্দোলনটি পরিচালনার সাংগঠনিক দায়িত্ব নেন। দেখা যায় যে, আন্দোলনটির সূত্রপাত টংক দ্বারা আক্রান্ত (বেশির ভাগই হাজং কৃষক) কৃষকসমাজ থেকেই। মূলত কৃষকদের অর্থনৈতিক সংকটের চাপেই এটি সংঘটিত হয়েছিল। আন্দোলনের প্রধান শক্তি হাজং কৃষকরা। হাজং কৃষকরা প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের অংশগ্রহণ এতই ব্যাপক ছিল, যার দরুন আন্দোলন সামলাতে কমিউনিস্ট পার্টিকেও হিমশিম খেতে হয়েছে। কেননা সশস্ত্র সংগ্রামের সর্বোচ্চ অস্ত্রের জোগান কৃষকদের তারা দিতে পারছিলেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাজং কৃষকরা তাঁদের সাধারণ অস্ত্র দিয়েই লড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অংশগ্রহণকারী সব হাজং কৃষককে ঢালাওভাবে কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষক সমিতির সভ্য–এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে না। ইতিহাস আলোচনায় অনেক জায়গায় গ্রামবাসীর অংশগ্রহণ দেখেছি। তাহলে তাঁরা সবাই কি কমিউনিস্ট? অবশ্যই নয়। কিন্তু আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সমর্থন ছিলো, অংশগ্রহণ ছিলো। এটি একটি সামন্ততান্ত্রিক শোষণ। টংক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলন বলা যাবে না। এখানে তাঁরা প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সময়কার জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য আন্দোলনটিকে সংগঠিত করা তাঁদের প্রয়োজন ছিল।

আবার সশস্ত্র সংগ্রামকে হাজং বিদ্রোহ উল্লেখ করে কমরেড নিবারণ পণ্ডিত লিখেছেন–

"... ... আমি ১৯৫০ সালের পূর্বেকার ময়মনসিংহ জেলার কৃষক নেতা মণি সিংহকে ও তাহার নেতৃত্বে কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধসংগ্রামকে শত-সহস্র

অভিনন্দন জানাই। যদিও ময়মনসিংহ জেলায় হাজং কৃষকদের বিদ্রোহ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি আমার মনে হয়, তেলেঙ্গানা কৃষকসংগ্রাম বা নকশলবাড়ী কৃষক বিদ্রোহের চেয়ে ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের বিদ্রোহ কোনো অংশেই ছোট ছিল না।"[১৯]

নিবারণ পণ্ডিত শুধুমাত্র এখানেই 'হাজং বিদ্রোহ' বলে উল্লেখ করেছেন। যা সমগ্র আন্দোলনের খণ্ডিত নামকরণ। আমার জানা মতে, তাঁর অন্য সব লেখায় তিনি টংক আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন বলে উল্লেখ করেছেন।

টংক আন্দোলনে হাজং কৃষকদের ত্যাগ অতুলনীয়। এবং টংক প্রথা ও আন্দোলনে অর্থনৈতিক ও শারীরিক নির্যাতন তারাই সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছে। সশস্ত্র সংগ্রামেও তারা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবু যদি টংক আন্দোলনকে আমি হাজং কৃষক আন্দোলন বলি, তাহলে অস্বীকার করা হবে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সব কমিউনিস্ট ও কৃষকসভার নেতাকর্মী, মুসলমান, হিন্দুসহ অন্যান্য আদিবাসী ডালু, গারো কৃষকদের অবদানকে। তাই টংক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে হাজং কৃষক আন্দোলন বলা যাবে না।

তাই আমি বলতে পারি, টংক আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে একটি কৃষক আন্দোলন। যার পরিচালনার সাংগঠনিক নেতৃত্বে ছিলেন মণি সিংহ ও কমিউনিস্ট পার্টি। এবং এর প্রধান শক্তি ছিলো আদিবাসী হাজং কৃষকরা। যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের ফলে টংক আন্দোলন সফল হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে একেবারেই বিলোপ ঘটেছিল টংক প্রথার মতো এক ঘৃণিত শোষণের।

এই হাজং কৃষকদের অবদানের কথা উল্লেখ করে মণি সিংহ লিখেছেন–

'... ... যে হাজং উপজাতি বীরত্ব, সাহস, ত্যাগ, নিষ্ঠার সাথে ওই সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল তাদের আমরা হারিয়েছি, তারা পিতৃপুরুষের ভিটা ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই একদিকে হয়েছে জয়, অপর দিকে হয়েছে পরাজয়।'

(জীবনসংগ্রাম, পৃ. ১১১)

প্রমথ গুপ্ত লিখেছেন– '... ... কিন্তু ইতিহাস বড়ই নির্মম। যে কৃষকরা দিনের পর দিন বুকের রক্ত দিয়া টংক প্রথাকে উচ্ছেদ করিয়াছেন, সেই আদিবাসী হাজং ডালু কৃষকরা আজ পাকিস্তান হইতে বিতারিত হইয়া আসামের বিভিন্ন জেলায় ও মেঘালয়ে উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করিতেছেন।'

(যে সংগ্রামের শেষ নেই, পৃ. ৫৭)

টংক আন্দোলনে কমিউনিস্ট, হাজং কৃষক ও অন্য কৃষকদের যে অবদান,

তা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। সবার বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্যই টংক আন্দোলন বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। তিনটি পর্যায়েই সাধারণ জনগণের সাথে ব্যাপক সম্পৃক্ততা, কৃষকদের শোষক শ্রেণির গ্রাস থেকে মুক্তির সংগ্রামের গুরুত্বের দিক বিবেচনা করলে আমি মনে করি, এটি কেবলমাত্র কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল বা সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। যা বাংলাদেশের প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য।

টংক আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন

(মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ও বিভিন্ন বই থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

রাশিমণি হাজং : ১৯৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি কুমুদিনী হাজংকে বাঁচাতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন টংক আন্দোলনের নেত্রী রাশিমণি হাজং। তিনি হাজং মাতা হিসেবে পরিচিত। টংক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তার একান্ত প্রচেষ্টায় নিজ গ্রাম দুর্গাপুরের বগঝড়ায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' সংগঠিত হয়েছিল। নিঃসন্তান রাশিমণি ছিলেন একজন দক্ষ ধাত্রী। জীবনের সবটুকু সময়েই তিনি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। ১৩৫০ বাংলা (১৯৪৫ খ্রি.) মহামন্বন্তরের সময় তিনি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজ প্রচেষ্টায় লঙ্গরখানা খুলে অসহায় মানুষের আহার যুগিয়েছিলেন। রাশিমণির জন্ম ১৮৯০ সালে। তাঁর দুই বিয়ে হয়। প্রথম স্বামী মারা যাবার পর তিনি পাঞ্জী হাজংয়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পাঞ্জী হাজং ছিলেন বৈষ্ণব। রাশিমণি শহিদ হওয়ার এক মাস পর পাঞ্জী হাজং আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেন। টংক আন্দোলনের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল রাশিমণি হাজংয়ের আত্মত্যাগ। তাঁর সীমাহীন ত্যাগের ফলেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন টংক আন্দোলনের লাখো বীর। তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই ২০০৪ সালে বহেরাতলী গ্রামে নির্মিত হয় রাশিমণি স্মৃতিসৌধ। যদিও রাশিমণি শহিদ হওয়ার মূল জায়গাটি এখন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এ অঞ্চলের মানুষ আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বীরমাতা রাশিমণি হাজংকে। তিনিই ছিলেন টংক আন্দোলনের প্রথম শহিদ নারী কৃষক।

সুরেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী, বাড়ি চারুয়াপাড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। জন্ম ১৯২০ সালে। সুরেন্দ্র হাজং ছিলেন একজন জঙ্গি কৃষককর্মী। ১৯৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি রাশিমণির সহযোদ্ধা হিসেবে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর সাথে বীরের মতো লড়ে শহিদ হন। তাঁর শহিদ হওয়ার পর তার পরিবার ভারতে চলে যায়।

ভূপেন ভট্টাচার্য : টংক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তাঁর আদিনিবাস ছিল

ফরিদপুর জেলায়। পরবর্তীকালে তাঁর পরিবার নেত্রকোনায় বসবাস শুরু করে। ভূপেন ভট্টাচার্য একান্ত নিষ্ঠার সাথে আন্দোলনে কাজ করেছেন। হাজংরা তাকে প্রিয় 'পাগলা' বলে ডাকতো। জনপ্রিয় এ নেতা টংক আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামের সময় ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হালুয়াঘাটে সন্ধ্যাকুড়া গ্রামে আন্দোলনের দায়িত্ব পালনকালে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

মঙ্গল চাঁদ সরকার (হাজং) : কৃষক জঙ্গিনেতা। জঙ্গি হামলায় ছিলেন দুর্ধর্ষ ও সাহসী। বাড়ি গুড়াগাঁও, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লেংগুড়ার হাঁটে আন্দোলনের প্রচারের সময় সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহিদ হন। শহিদ হওয়ার পর তাঁর পরিবার ভারতে চলে যায়। তাঁর সব সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

অগেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি তারানগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। তিনি আন্দোলনের একজন সক্রিয় জঙ্গিকর্মী ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লেংগুড়ার হাঁটে প্রচারের সময় পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

সুরেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি তারানগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লেংগুড়ার হাঁটে প্রচারের সময় পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

রেবতী হাজং : সক্রিয় কৃষককর্মী। বয়স ১৯ বছর। বাড়ি লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্প আক্রমণে পুলিশের সাথে সশস্ত্র লড়াইয়ে শহিদ হন।

শঙ্খমণি হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ। মাত্র ২০ বছর বয়সে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের পরিচয় দেন। ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লেংগুড়ায় পুলিশের সাথে সশস্ত্র লড়াইয়ে শহিদ হন।

স্বরাজ হাজং : কৃষককর্মী। আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। বাড়ি রাণীগাঁও, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লেংগুড়ায় পুলিশের সাথে সশস্ত্র লড়াইয়ে শহিদ হন।

টুপাঙ্ক হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি চৈতন্যনগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লেংগুড়ায় পুলিশের সাথে লড়াইয়ে শহিদ হন।

সারথী হাজং : কৃষককর্মী। কৃষক নেতা কাঙ্গাল দাসের (হাজং) স্ত্রী। লেংগুড়ায় ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লড়াইয়ে শহিদ হন।

যোগেন গুণ (হাজং) : কৃষককর্মী। বাড়ি লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লেংগুড়ার লড়াইয়ে শহিদ হন।

কালীমণি হাজং : কৃষককর্মী। লেংগুড়ার লড়াইয়ে শহিদ।

শশী হাজং : কৃষককর্মী। লেংগুড়ার লড়াইয়ে শহিদ।
কেসব হাজং : কৃষককর্মী। লেংগুড়ার লড়াইয়ে শহিদ।
দিরা মোহন হাজং : কৃষককর্মী। লেংগুড়ার লড়াইয়ে শহিদ।
ভীম চন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। লেংগুড়ার লড়াইয়ে শহিদ।
বদক : কৃষককর্মী। সানখোলার মাঠে শহিদ।
রহিম : কৃষককর্মী। সানখোলার মাঠে শহিদ।
রামদয়াল সরকার : বৃদ্ধ কৃষক। বয়স ৫৮। বাড়ি জাঙ্গালিয়া গ্রামে। কুলসিন্দুর হাঁট হতে ফেরার পথে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।
রামচরণ : বৃদ্ধ কৃষক। বয়স ৬২। বাড়ি জাঙ্গালিয়া গ্রামে। কুলসিন্দুর হাট হতে ফেরার পথে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।
সুদর্শন : কৃষককর্মী। বয়স ২৭। জন্ম হালুয়াঘাটের গবরাকুড়া গ্রামে। কড়াইতলা গ্রামে পুলিশের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে শহিদ হন।
ধ্রুব হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি নয়াপাড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। তিনি বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি হামলায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে পুলিশ তাকে সানখোলা থেকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীকালে নিতাই নদীর পাড়ে কলসিন্দুর নামক স্থানে অন্য সবার সাথে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়।
হরিসিং ডালু : কৃষককর্মী। বয়স ২৫। জন্ম হালুয়াঘাটের কুমারগাতী গ্রামে। কড়াইতলা গ্রামে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।
দাফা হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। ললিত সরকারের (হাজং) বাড়িতে রাখালের কাজ করতেন। তাদের পরিবারের কাছে তিনি ছিলেন সন্তানতুল্য। দাফা হাজং 'কৃষক সমিতির' একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সমিতির হ্যান্ডবিল বিলিসহ অন্যান্য প্রচারের কাজ করতেন। সশস্ত্র সংগ্রামের সময় পুলিশের সাথে লড়ে শহিদ হন।
হরেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের কমিউনিস্ট পার্টির কমিউনে কাজ করতেন। সশস্ত্র সংগ্রামের সময় লেংগুড়ায় ফিরে আসেন। পুলিশের কাছ থেকে টংক ধান উদ্ধারের সময় পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।
সতীন্দ্র ডালু : কৃষককর্মী। বয়স ৩০ বছর। জন্ম নালিতাবাড়ীর মধ্যকুড়া গ্রামে। সালমারা গ্রামে পুলিশের সাথে লড়াইয়ে শহিদ হন।
দুবরাজ হাজং : কৃষককর্মী। বয়স ৩২ বছর। জন্ম সুসং দুর্গাপুরের রাণীপুর গ্রামে। দুবরাজ ছিলেন বিশিষ্ট জঙ্গি নায়ক। রাণীপুরে পুলিশের সাথে লড়াইয়ে শহিদ হন।
ক্ষীরোদ হাজং : কৃষককর্মী। বয়স ৪০ বছর। সানখোলা গ্রামে জন্ম। রাণীপুরের

লড়াইয়ে শহিদ হন।

অনন্ত হাজং : কৃষককর্মী ও সংগঠক। বয়স ৫০ বছর। জন্ম ভেদীকুড়া গ্রাম সুসং দুর্গাপুর। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। জীবনের প্রথম অংশে সাধু ছিলেন। পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হন এবং টংক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। রাণীপুরের লড়াইয়ে শহিদ হন।

বীরঙ্গ হাজং : কৃষককর্মী। বয়স ৩০। বাড়ি ঘোষগাঁও, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। রাণীপুর লড়াইয়ে শহিদ।

নরেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বয়স ৩৪। বাড়ি ঘোষগাঁও, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। রাণীপুর লড়াইয়ে শহিদ।

বিনোদ হাজং : কৃষককর্মী। বয়স ৪২ বছর। রাণীপুর ময়দানে শহিদ।

চন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। জন্ম রাণীপুর। বয়স ৩৫ বছর। রাণীপুর লড়াইয়ে শহিদ।

অনুরূপ (অনন্ত) হাজং : কৃষককর্মী। চন্দ্র হাজংয়ের সহোদর ভাই। জন্ম রাণীপুর, রাণীপুর ময়দানে শহিদ।

যোগেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বয়স মাত্র ১৭ বছর। ১৯৫০ সালে রাংটিয়া পাহাড়ে গেরিলা ক্যাম্পে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

রবিদাম : কৃষক নেতা। জন্ম সুনামগঞ্জ। সুনামগঞ্জের টংক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। মোহনপুর গ্রামে সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকালে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

চন্দ্র সরকার (হাজং) : কৃষককর্মী। বাড়ি লক্ষ্মীকুড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি ১৯৪৯ সালে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। কথিত আছে, তার মাথা হতে পা পর্যন্ত পুলিশ হাতুড়ি দিয়ে পেটায়। এমন সীমাহীন নির্যাতনের ফলে তিনি ময়মনসিংহে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিজমোহন হাজং : কৃষককর্মী। বয়স ৩৫ বছর। বাড়ি সুসং দুর্গাপুরের ভরতপুর গ্রামে। নিজের বাড়িতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

বিজয় মণ্ডল : কৃষককর্মী। বয়স ৪৫ বছর। বাড়ি হালুয়াঘাট থানার ঘোষগাঁও। ১৯৫০ সালে চেরাখালী ক্যাম্পে মৃত্যুবরণ করেন।

গোষ্ঠ সিংহ : কৃষককর্মী। বয়স ৬৪ বছর। বাড়ি দুমনীকুড়া গ্রাম। ১৯৫০ সালে গেরিলা ক্যাম্পে মৃত্যুবরণ করেন।

মণীন্দ্র কর : সংবাদবাহী কমিউনিস্ট কর্মী। বাড়ি কাইলাটী গ্রাম, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা। ১৯৪৯ সালে দায়িত্ব পালনকালে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। পরবর্তীকালে পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে।

নয়ন সরকার (হাজং) : বিশিষ্ট জঙ্গি কৃষককর্মী। বয়স ৪৫ বছর। বাড়ি

দুর্গাপুরের কালীকাবাড়ী গ্রামে। ১৯৪৭ সালে ভালুয়াকাপাড়া পুলিশের অস্ত্র দখল করে। ১৯৫০ সালে চেরাখালী ক্যাম্পে মৃত্যুবরণ করেন।

বীরু হাজং : কৃষককর্মী। বয়স ৩২ বছর। বাড়ি সুসং দুর্গাপুরের নলগড়া গ্রামে। চেরাখালী ক্যাম্পে মৃত্যুবরণ করেন।

বলেশ্বর হাজং : কৃষককর্মী। বয়স ২১ বছর। বাড়ি হালুয়াঘাট থানার লক্ষ্মীকুড়া গ্রামে। ১৯৪৮ সালে মারা যান।

মাহতাব উদ্দিন : কৃষককর্মী। সশস্ত্র লড়াইয়ে শহিদ হন।

প্রাণেশ হাজং : তরুণ কৃষক। বটতলায় পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

কোকিলা হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। কমরেড ললিত সরকারের (হাজং) মেয়ে। ১৯৫০ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের সময় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। তার খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।

পার্বতী হাজং : কৃষক। বয়স ৭০। বাড়ি জাগীরপাড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিশ তাঁকে গাছের সাথে বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে হত্যা করে; কিন্তু কথা আদায় করতে পারেনি।

গিরীন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। কলমাকান্দা জাগীরপাড়া গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের গুলিতে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হন।

যতীন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। কলমাকান্দা জাগীরপাড়া গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের গুলিতে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হন।

কৃত্তিবাস : কৃষককর্মী। কলমাকান্দা জাগীরপাড়া গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের গুলিতে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হন।

যোগেন্দ্র : কৃষককর্মী। কলমাকান্দা জাগীরপাড়া গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের গুলিতে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হন।

পরমেশ্বও : কৃষককর্মী। কলমাকান্দা জাগীরপাড়া গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের গুলিতে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হন।

অনন্ত : কৃষককর্মী। কলমাকান্দা জাগীরপাড়া গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের গুলিতে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হন।

বিদ্যাধর : কৃষককর্মী। কলমাকান্দা জাগীরপাড়া গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের গুলিতে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হন।

জার্মানী : কৃষককর্মী। কলমাকান্দা জাগীরপাড়া গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের গুলিতে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হন।

পদ্মমণি : কৃষককর্মী। কলমাকান্দা জাগীরপাড়া গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের গুলিতে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হন।

নীলমণি : কৃষককর্মী। কলমাকান্দা জাগীরপাড়া গ্রামে গভীর রাতে পুলিশের

গুলিতে ঘুমন্ত অবস্থায় শহিদ হন।

কমল হাজং : কৃষককর্মী। ১৯৪৯ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

ব্রজ মোহন : কৃষককর্মী। ১৯৪৯ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

সুরেন্দ্র ডালু : কৃষককর্মী। বয়স ৩৬ বছর। ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যু বরণ করেন।

রবীন্দ্র : কৃষককর্মী। ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

গোপীনাথ : কৃষককর্মী। ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

ঘাওয়া রাম : কৃষককর্মী। ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

গোপাল : কৃষককর্মী। ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

গৌরাঙ্গ : কৃষককর্মী। ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

কেনারাম : কৃষককর্মী। ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

জন্মেজয় : কৃষককর্মী। ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন

রতিকান্ত : কৃষককর্মী। ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যুবরণ করেন।

শচী রায় : কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী। টংক আন্দোলনের সংগঠক। বাড়ি নালিতাবাড়ী, শেরপুর। বয়স ৩৫ বছর। সশস্ত্র আন্দোলনের সময় বোমা প্রস্তুত করতে গিয়ে বিস্ফোরণে শহিদ।

পূর্ণ হাজং : কৃষককর্মী। বোমা তৈরির সময় শহিদ হন।

রজনী সরকার (হাজং) : কৃষক সংগঠক। বাড়ি ঘোষগাঁও, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। বয়স ৩০ বছর। চেরাখালী ক্যাম্পে পুলিশের গুলিতে শহিদ।

হৃদয় শুক্লদাস : কৃষককর্মী, বাড়ি সিংহের বাংলা, নেত্রকোনা। আন্দোলনের সময় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

বিপিন বৈষ্ণব : কৃষককর্মী। বাড়ি লাউচাপড়া। আন্দোলনের সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

সুধীন দাস (মামু) : কৃষক সংগঠক। হাজং অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন।

আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন

(মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ও বিভিন্ন বই থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

মণি সিংহ

'তুচ্ছ করেছ রাজপ্রাসাদের মণিমানিকের শোভা,/তুচ্ছ করেছ বন্ধু স্বজন পরিজন মনোলোভা,/তুচ্ছ করেছ রাজভয় আর শাসন ত্রাসন জ্বালা,/কণ্ঠে পরেছ শত শোষিতের জীর্ণ হাড়ের মালা।'

হ্যাঁ, রাজা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের মিছিলে। একে একে পাড়ি দিয়েছিলেন কণ্ঠকাকীর্ণ পথ। জীবনের সেই পথ কখনো হয়েছে অগ্নিদগ্ধ, কখনো হয়েছে রক্তাক্ত। তবু মানুষের মুক্তির সংগ্রামে ছিলেন অবিচল। তিনি গণমানুষের অবিসংবাদিত নেতা মণি সিংহ। সেই প্রিয় নেতাকে উদ্দেশ্য করেই পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর 'যে দেশে মানুষ বড়' বইয়ের উৎসর্গপত্রে পঙ্‌ক্তিগুলো রচনা করেছিলেন।

কমরেড মণি সিংহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অনবদ্য সূর্যসৈনিক। যার দীপ্ত পথচলা সেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম, বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে শোষিত কৃষক : শ্রমিকের মুক্তির জন্য কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন আন্দোলন ও দেশবিভাগের পরে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে যে অবদান রেখে গেছেন, তা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

জন্ম ও পরিচয় : মণি সিংহের পিতা-কালী কুমার সিংহ ছিলেন নেত্রকোনার পূর্বধলার জমিদার পরিবারের সন্তান। যিনি চাকরিসূত্রে বসবাস করতেন কলকাতায়। তার মা ছিলেন নেত্রকোনার সুসং দুর্গাপুরের জমিদার বংশের। ১৯০১ সালের ২৮ জুলাই কলকাতায়ই মণি সিংহের জন্ম। মাত্র আড়াই বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। পিতাকে হারিয়ে তার চার ভাই, এক বোন ও বিধবা মায়ের সংসার সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হন তারা। কিছুদিন অবস্থান করেন ঢাকায় মামা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন

সিংহের বাড়িতে। পরবর্তীকালে চলে যান নেত্রকোনার সুসং দুর্গাপুরে। তার বিধবা মা সুসং জমিদারবংশের মেয়ে সেই সূত্রে তার পরিবার জমিদারদের কাছ থেকে বসতবাড়িসহ কিছু ভূসম্পত্তি, বার্ষিক খোরাকি ও শরিক হিসেবে মাসোহারা পান। সুসং দুর্গাপুরেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়।

কৈশোরেই শৃঙ্খলমুক্তির মিছিলে : তার রক্তের ভেতরে ছিল মুক্তির মন্ত্র। ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা খুব অল্প বয়সেই টগবগ করে উঠেছে তাঁর রক্তস্রোতে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কৈশোরেই। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক পড়ার জন্য চলে আসেন কলকাতায়। ভারতমাতার মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে ১৯১৪ সালে যোগ দেন কংগ্রেসের বিপ্লবী দল 'অনুশীলনে'। দেশাত্মবোধের চরম উৎকর্ষতায় তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে খুব অল্প সময়েই 'অনুশীলন' দলে নিজের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন তরুণ মণি সিংহকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। এইসব গণজাগরণ তাকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করে। আন্দোলনে সাধারণ জনগণকে আরো সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি তার গ্রাম সুসং দুর্গাপুরের আদিবাসী হাজং কৃষকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই প্রেক্ষাপটে হাজং কৃষকদের সাথে সম্পৃক্ততা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্ক্স-লেনিনবাদে দীক্ষা গ্রহণ ও শ্রমিক আন্দোলন

সুসং দুর্গাপুরে মণি সিংহ যখন হাজং কৃষকদের কংগ্রেসের আন্দোলনে সম্পৃক্ততার জন্য কাজ করছিলেন, তখন এখানেই পরিচয় ঘটে রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী এবং এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী গোপেন চক্রবর্তীর সাথে। তাঁর সাথে দীর্ঘ যুক্তিতর্কের পর মণি সিংহ মার্ক্স-লেনিনবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি যুক্ত হন মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক আন্দোলনে। মেটিয়াবুরুজ একটি শ্রমিক এলাকা। কলকাতা থেকে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। সেখানে কেশোরাম কটন মিলে ১৩ দিনব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়ে দাবি আদায় করতে সক্ষম হন।

টংক ও তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব

১৯৩০ সালে মাস্টার দ্য সূর্যসেনের চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফলে ব্রিটিশ সরকার ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার শুরু করে। বিনা বিচারে আটক রাখা হয় অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে । এ বছরেরই ৯ মে কলকাতায় গ্রেপ্তার হন

মণি সিংহ। টানা পাঁচ বছর বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। ১৯৩৫ সালে সুসং দুর্গাপুরে নজরবন্দী রাখা হয়। সুসংয়ে থাকা অবস্থায় তিনি টংক কৃষকদের (বেশির ভাগই হাজং কৃষক) শোষণের চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তী সময়ে পাট চাষ কমানোর সভায় বক্তব্যের অপরাধে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৩৭ সালে মুক্তি লাভের পর তিনি সুসং দুর্গাপুরে আসেন। তখন টংকের হার চরম পর্যায়ে উঠে যায়। এ অবস্থায় কৃষকরা আন্দোলনে মণি সিংহের নেতৃত্ব কামনা করলে তিনি কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ান। সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে টংকের নেতৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। ফলশ্রুতিতে জমিদার আত্মীয়দের বিরাগভাজন হন। তবু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে নিজের টংক কৃষকের খাজনা মওকুফ করে দেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ টংক আন্দোলনের প্রথম দফা, ১৯৪৬-১৯৪৭ দেশবিভাগের আগ পর্যন্ত টংক আন্দোলনের দ্বিতীয় দফা এবং ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ টংক আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রাম তাঁর নেতৃত্বে সফলভাবে পরিচালিত হয়। যদিও টংক আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল কমিউনিস্টদের উগ্র রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। খুব শীঘ্রই মণি সিংহ এই বিষয়টি বুঝতে পেরে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নেন। হাজং কৃষকদের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামকে কাজে লাগিয়ে মণি সিংহের নেতৃত্বে এ সশস্ত্র সংগ্রাম পাকিস্তানি শাসকদের ভিত নাড়িয়ে দেয়। পাহাড়ি অঞ্চলে টংক আন্দোলনের নেতৃত্বের পাশাপাশি ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি সফলতার সাথে নেত্রকোনায় তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃত্ব

১৯২৮ সাল থেকে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। ১৯৪২ সালে ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সেক্রেটারি। ১৯৪৩ সালে বোম্বে সম্মেলনে ময়মনসিংহ জেলা কমিটির প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ ও ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান

১৯৭১ সালে জেল থেকে মুক্তি লাভের পর যুক্ত হন মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর প্রচেষ্টায় ন্যাপ-সিপিবি-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। যুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন তিনি। জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য

তিনি ২০০৪ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন।

পরিবার

মণি সিংহের স্ত্রী অনিমা সিংহ ছিলেন একজন সংগ্রামী কৃষক নেত্রী। ১৯৮০ সালে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। একমাত্র পুত্র দিবালোক সিংহ একজন চিকিৎসক ও রাজনৈতিক নেতা।

তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ– জীবন সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৮৩।

চিরঞ্জীব প্রাণ

১৯৮৪ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে তিনি শয্যাশায়ী হন। ১৯৯০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে ৯০ বছর বয়সে সমাজতন্ত্রের এ স্বপ্নদ্রষ্টা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড মণি সিংহ বাংলাদেশর গণমানুষের নেতা। মানবমুক্তির আলোর দিশারী, ত্যাগী এ নেতা তার অবদানের জন্য চির অম্লান হয়ে থাকবেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি এ সমাজের, দেশের সব মুক্তিকামী মানুষের নেতাতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই কবি শামসুর রাহমানের সুরে বলতে হয়–

"... ... ...প্রগতির/প্রসিদ্ধ চরণ জেগে ওঠো চেয়ে দ্যাখো–/করোনি শাসন কোনো দিন তবু বাংলাদেশ আজ/তোমাকেই গার্ড অব অনার জানায়।"

খোকা রায় : তিনি খোকা রায় নামে সমধিক পরিচিত থাকলেও তার আসল নাম সুধীন্দ্র কুমার রায়। বাড়ি ময়মনসিংহ। আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। জন্ম ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি যোগ দেন অসহযোগ আন্দোলনে। যুক্ত হন 'যুগান্তর'-এর সাথে। ১৯৩০ সালে জামালপুর শহরের ফেরিঘাটে পুলিশের ওপর গুলিবর্ষণ ও গোয়েন্দা বিভাগের এক ইন্সপেক্টরকে হত্যারচেষ্টার অপরাধে গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন জেলখানা ঘুরিয়ে তাকে নির্বাসন দেওয়া হয় আন্দামান সেসুলার জেলে। সেখানেই তিনি মার্ক্স-লেনিনবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন। মুক্ত হয়ে ১৯৩৮ সালে ময়মনসিংহ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যুক্ত হন টংক আন্দোলনে। দেশবিভাগের দশ বছর পর তিনি ভারতের কলকাতায় চলে যান। ১৯৯২ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আলতাব আলী : বাড়ি শেহড়া, ময়মনসিংহ। জন্ম ১৯০৭। তিনি টংক

আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। তিনি কিশোর বয়সেই বিট্রিশবিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে দীর্ঘদিন কারাভোগ করেন। কারাগারেই মণি সিংহের সান্নিধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং ১৯৩৮ সালে ময়মনসিংহ জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নির্বাচিত হন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন টংক আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে। ১৯৮০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ললিত সরকার হাজং : বাড়ি লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম কৃষক নেতা। টংক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। জন্ম ১৯০৭ সালে সম্ভ্রান্ত হাজং পরিবারে। স্কুলে পড়া অবস্থায় যুক্ত হন কংগ্রেসের অসযোগ আন্দোলনে। মণি সিংহের সান্নিধ্যে তিনি মার্ক্সবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যুক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে। ত্যাগী এই নেতা তাঁর সব সম্পত্তি কমিউনিস্ট পার্টিকে দান করেছিলেন। টংক আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি লেংগুড়া অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি চলে যান ভারতের মেঘালয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি শরণার্থীশিবিরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘটিত করাসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীনতার পর দেশে এসে দেখা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হলে আবার দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। দেশপ্রেমিক, টংক আন্দোলনের এই লড়াকু সৈনিক আর্থিক দৈন্যদশার মধ্যে ১৯৮৪ সালের ২৭ জুলাই ভারতের মেঘালয়ে তুরা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

পুলিন বক্সী : বাড়ি শেরপুর। জন্ম ১৯০৭ সালে। তিনি টংক আন্দোলনে প্রথম সারির নেতা। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে পুলিন বক্সী যুক্ত হন বিপ্লবী দল 'অনুশীলন'-এ। পরবর্তীকালে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। ১৯২৯ সালে সরকারের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভের পর ময়মনসিংহে ফিরে এসে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। দেশবিভাগের পর তিনি ভারতে চলে যান। এবং ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুনির্মল সেন : ময়মনসিংহ। আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। আন্দোলনের শুরু থেকেই যুক্ত হন। সশস্ত্র সংগ্রামের সময় পার্টির সাথে তার মতবিরোধ হওয়ায় সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি অংশগ্রহণ করেননি।

ক্ষিতীশ চক্রবর্তী : বেতাল, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ। জন্ম ১৯০৯। তিনি টংক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি যুক্ত হন যুগান্তর দলে। ১৯৩০ সালে তাকে গ্রেপ্তার করে সরকার তাঁর ওপর মিথ্যা মামলা

দায়ের করে। **১৯৩১** সালে মুক্তি দিয়ে জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে থাকা অবস্থায়ই তিনি মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হন। **১৯৩৫** সালে তাকে কলকাতা জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলে তিনি আসেন ময়মনসিংহে এবং যুক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে। **১৯৩৮** সালে চলে আসেন ময়মনসিংহে এবং যুক্ত হন টংক আন্দোলনে। টংক আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পার্টির সাথে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি।

বল্লভী বক্সী : শেরপুর। আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা।

বিপিন গুণ (হাজং) : বাড়ি লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। আন্দোলনের অন্যতম কৃষক নেতা। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশেষ অবদান রাখেন।

পরেশ সরকার (হাজং) : কৃষক নেতা, মণি সিংহের অন্যতম সহযোগী, বাড়ি বাঘপাড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

প্রমথ গুপ্ত : শেরপুর, আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। আন্দোলনের শুরু থেকেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সশস্ত্র সংগ্রামের সময় তিনি হালুয়াঘাটের কৃষকদের সংগঠিত করার দায়িত্বে ছিলেন।

জলধর পাল : নালিতাবাড়ী, শেরপুর। আন্দোলনের প্রথম সারির সংগঠক। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

রবি নিয়োগী : শেরপুর। জন্ম **১৯১০**। কিশোর বয়সেই যুক্ত হন 'যুগান্তর' দলের সাথে। **১৯৩১** সালে তাকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন জেল ঘুরিয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরণ করা হয়। এ সময়ই তিনি মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হন। যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। তিনি **১৯৪৮** সালে সক্রিয়ভাবে টংক আন্দোলনে যোগদান করেন। এবং সশস্ত্র সংগ্রামে শেরপুর অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন। দেশপ্রেমিক, ত্যাগী এই নেতা রাজনৈতিক জীবনে বহুবার কারাবরণ করেছেন। ২০০২ সালের ১০ মে শেরপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আবুল জামাল মুহামেদ তকীয়ূল্লাহ্ : তিনি মুহাম্মদ তকিয়ূল্লাহ্ নামে অধিক পরিচিত। জন্ম-**১৯২৬** সালের ৪ নভেম্বর, ঢাকা। পিতা-জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্। **১৯৫০** সালে টংক আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামের সময় তিনি ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এ সময় টংক আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকা শহরে ব্যাপক পোস্টারিং করা হয়। পোস্টারিং করার সময় তার ভাই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। তকীয়ূল্লাহ্কে ধরার জন্য সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

জিতেন মৈত্র : নালিতাবাড়ী, শেরপুর। আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

জামেশ্বর সরকার (হাজং) : আদিবাসী কৃষক নেতা। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে

অংশগ্রহণ করেন।

শশীন চক্রবর্তী : নেত্রকোনায় টংক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। অন্যতম সংগঠক। জন্ম ১৯০৭। বাড়ি নেত্রকোনা। বাবা শ্যামাচরণ চক্রবর্তীর একমাত্র ছেলে। বাবার মৃত্যুতে তালুকদারি দেখার দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। কিন্তু দেশমাতৃকার টানে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি কংগ্রেসের বিপ্লবী দল যুগান্তরের সদস্য হন। জড়িয়ে পড়েন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে। ১৯৩১ সালে বিট্রিশ জেলা শাসক গ্রাহামকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে গ্রেপ্তার হন। নির্বাসিত হন আন্দামান সেলুলার জেলে। তাঁর ওপর চালানো হয় অমানুষিক পুলিশি নির্যাতন। আন্দামানেই তিনি মার্ক্সীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে কারামুক্তির পর যুক্ত হন টংক আন্দোলনে। একনিষ্ঠভাবে আন্দোলন পরিচালনা করেন। দেশবিভাগের পর তিনি ভারতে চলে যান। যুক্ত হন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে। ১৯৮২ সালের জুন মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রাজেন পাল : নালিতবাড়ী, শেরপুর। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

জহির উদ্দিন মুন্সি : মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা। টংক ও তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। তথ্য অনুসারে তিনি নেত্রকোনায় প্রথম মুসলমান কমিউনিস্ট। বাগ্মী এই নেতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার কচুয়ারচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আমির উদ্দিন। তিনি মোহনগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে নেত্রকোনা দত্ত উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। আনন্দমোহন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ সময় তিনি গ্রেফতার হয়ে হুগলী কারাগারে স্থানান্তরিত হন। এবং মুক্তি লাভের পর মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪১ সালে তিনি ময়মনসিংহ কৃষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনে ময়মনসিংহ জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন। টংক আন্দোলনে প্রথম ২টি পর্যায়ে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কৃষক আন্দোলনের এই যোদ্ধা ১৯৫২ সালে টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

মৌলবী আব্দুল হান্নান : বালি, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা। তিনি টংক আন্দোলনে মণি সিংহের অন্যতম সহযোগী। আন্দোলনের সময় তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। তার জন্ম ১৯০৩। পিতা আব্বাছ উদ্দিন সরকার। লক্ষ্মীগঞ্জে তার প্রাথমিক শিক্ষা, বালি মাদরাসায় এবং ময়মনসিংহের আলিয়া মাদরাসা থেকে পড়ালেখা শেষ করেন। ১৯৪০ সালে

কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। নেত্রকোনা সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের সফলতায় তার দায়িত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১৯৯২ সালের ২৭ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ক্ষিতীশ সরকার : বিষ্ণুপুর, আটপাড়া, নেত্রকোনা। জন্ম ১৯০১। বাবা জয়চন্দ্র সরকার। তিনি ১৯২১ সালে 'অনুশীলন' সদস্য হিসেবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। পরে মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তিনি নেত্রকোনায় আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক।

সুকুমার ভাওয়াল : তার আদি বাড়ি নারায়ণগঞ্জ। পরবর্তীকালে পার্টির সাংগঠনিক কাজ করার জন্য নেত্রকোনায় চলে আসেন। এবং টংক আন্দোলনের সময় নিষ্ঠার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন।

খুসু দত্ত : আদি বাড়ি কিশোরগঞ্জ। পরবর্তীকালে নেত্রকোনায় আসেন। এবং টংক আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে নিজেকে আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

নিবারণ পণ্ডিত : কিশোরগঞ্জ। পাঁচালির প্রকরণে বিপ্লবী গণসংগীত রচয়িতা ও গায়ক। সশস্ত্র সংগ্রামের সময় পাহাড় অঞ্চলে গান গেয়ে জনগণকে আন্দোলনে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন।

রেবতীমোহন রায় : নেত্রকোনা। শেষ পর্যায়ের আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

হেমন্ত ভট্টাচার্য : শেরপুর। আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।

ভুপেন নাগ : শেরপুর। আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।

হীরু ভট্টাচার্য : শেরপুর। আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।

হারু চক্রবর্তী : বাগরাশা, শেরপুর। আন্দোলনের একজন জঙ্গিকর্মী।

মহাদেব সান্যাল : ময়মনসিংহ। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সত্য কিরণ আদিত্য : হাজরাগাতি, মদন, নেত্রকোনা। ছাত্রাবস্থায় আন্দোলনের শেষ পর্যাযে যুক্ত হন।

ডা. মৃণাল বিশ্বাস : মন্তলা, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। কলমাকান্দা : দুর্গাপুর অঞ্চলে আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

আশুতোষ সাহা : হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

জিতেন সেন : আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক।

সতু রায় : রামেশ্বরপুর, আটপাড়া, নেত্রকোনা। আন্দোলনের সময় সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।

শৈলেন্দ্র রায় : রামেশ্বরপুর, আটপাড়া, নেত্রকোনা। আন্দোলনের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।

রতু রায় : রামেশ্বরপুর, আটপাড়া, নেত্রকোনা। আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

আশু দত্ত : আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক।

কনা পাল : শেরপুর। জলধর পালের স্ত্রী। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

জ্যোৎস্না নিয়োগী : শেরপুর, আন্দোলনের প্রথম সারির সংগঠক। রবি নিয়োগীর স্ত্রী। তিনি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

যুঁইফুল রায় : ময়মনসিংহ। তিনি খোকা রায়ের স্ত্রী। আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

বীণা চক্রবর্তী : বাড়ি নেত্রকোনায়। তিনি ক্ষীতিশ চক্রবর্তীর স্ত্রী। আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

কাঙ্গাল দাস (হাজং) : আন্দোলনের অন্যতম কৃষক নেতা। বাড়ি চৈতন্যনগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

কলাবতী হাজং : সক্রিয় কৃষক নেত্রী। আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। বাড়ি লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

রমণী মানিক হাজং : কৃষক নেত্রী। লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। ললিত সরকার (হাজং)-এর স্ত্রী। আন্দোলনে তিনি আদিবাসী নারীদের সংগঠিত করেন।

যাদুমণি হাজং : কৃষক নেত্রী। সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বাড়ি চৈতন্যনগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

লিলি বক্সী : শেরপুর। বল্লভী বক্সীর স্ত্রী। সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

অনিমা দাম : সুনামগঞ্জ। তিনি আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

পবিত্র শঙ্কর : আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

জ্যোতিষ রায় : কিশোরগঞ্জ। মাঝে মাঝে দুর্গাপুরে এসে আন্দোলনে সহযোগিতা করেছেন।

নগেন সরকার : কিশোরগঞ্জ। মাঝে মাঝে দুর্গাপুরে এসে আন্দোলনে সহযোগিতা করেছেন।

মুকুল বসু : সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

ভবনী শংকর হাজং : কৃষককর্মী। লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

নগেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মহেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা। তিনি

আন্দোলনকারীদের অন্যতম সহযোগী।

দীপচান হাজং : কৃষককর্মী। লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ললিত মোহন হাজং : কৃষক নেতা। তিনি কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। বাড়ি চৈতন্যনগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

সুন্দ্রা হাজং : কৃষককর্মী। চৈতন্যনগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ধীরিয়া হাজং : কৃষককর্মী। চৈতন্যনগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

ভদ্রমণি হাজং : কৃষককর্মী। তিনি ধীরিয়া হাজংয়ের স্ত্রী, চৈতন্যনগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

অশ্বমণি হাজং : কৃষককর্মী। রাজনগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

হেমন্তী হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি গোড়াগাঁও, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

অভয় হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বগাডুবি, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

লক্ষ্মীকান্ত হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি মানিকপুর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

রমেশ হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি কালিকাপুর, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

বাঁধন হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি কালিকাপুর, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

রথীন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি হরিণাকুড়ি, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

গণেশ হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি শালিকাবাম, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

কুমিল হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি শালিকাবাম, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

যোগেন হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বেতগড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

নারায়ণ চন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি পাঁচগাঁও, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

আদিনাথ হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি রাণীগাঁও, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

প্রভাবতী হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি আড়াপাড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

বীরচান হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি আড়াপাড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

বাসন্তী হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি আড়াপাড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

লবেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি আড়াপাড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

শিরিন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি আড়াপাড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

সুখমণি হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি জগৎকুড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

যামিনী হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি আড়াপাড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

রনেবালা হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি আড়াপাড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

মঙ্গল চাঁদ হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি আড়াপাড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

বাইদো হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি জগৎকুড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

ধরণী কান্ত হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বগাউড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

ভৌমিত হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বগাউড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

যতীন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বগাউড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

লংকেশ্বর হাজং : কৃষক নেতা। বাড়ি বহেরাতলী, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।
জগেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বহেরাতলী, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।
তারাচান হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বহেরাতলী, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।
গজেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বহেরাতলী, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।
রাজেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বহেরাতলী, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।
কুমুদিনী হাজং : কৃষককর্মী। ১৯৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি তাকে বাঁচাতে রাশিমণি হাজং শহিদ হওয়ার পর কুমুদিনী হাজং আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে যান। পুলিশের মামলায় দীর্ঘদিন সরস্বতী ছদ্ম নামে পলাতক ছিলেন।
বিপিন হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লাঙ্গলজোড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
সিরাম হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লাঙ্গলজোড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
মহেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লাঙ্গলজোড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
নিকুঞ্জ হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি ঘোষগাঁও, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
ভূপেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লাঙ্গলজোড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
রজনী হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লাঙ্গলজোড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
রঙ্গমণি হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লাঙ্গলজোড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
জেহাল হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লাঙ্গলজোড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
তনেশ্বরী হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি লাঙ্গলজোড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
দুঃখশ্বর হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বাঘপাড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
সুরেন্দ্র হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি বাঘপাড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
ধ্রুপদী হাজং : কৃষককর্মী। বাড়ি নলগড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।
নিত্যানন্দ সরকার : কৃষককর্মী। সিংহের বাংলা, নেত্রকোনা।
ফজর আলী : কৃষককর্মী। ঝিমটি, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।
গণেশ ধুবী : কৃষককর্মী। সিংহের বাংলা, নেত্রকোনা।
রনিলা বোনায়ারী : খুব অল্প বয়সে ছাত্র অবস্থায় শেষ পর্যায়ে আন্দোলনে যোগদান করেন। বাড়ি বালুচড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।
ফটিক : কৃষককর্মী। সিংহের বাংলা, নেত্রকোনা।
ঈমান আলী : কৃষককর্মী। বাড়ি তেরতোপা, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।
ইছমাহিল হোসেন পঞ্চায়েত : কৃষককর্মী। বাড়ি রাজনগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।
প্রভাত চন্দ্র সরকার : কৃষককর্মী। বাড়ি হরিণধরা, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।
উমেশ সরকার : কৃষককর্মী। বালি নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা।

তথ্যসূত্র

১. আদিবাসী লোকসাহিত্য, ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১২।
২. গারো পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী, আলী আহাম্মদ খান আইয়োব, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৯৬।
৩. ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৬৪।
৪. সামান্তবাদী উৎপাদন : সমাজ বিকাশের তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ দাস সমাজের পর সামন্ত সমাজের বিকাশ ঘটে। এ যুগে দাসরা হয় প্রজা আর তার প্রভুরা হয়ে ওঠে জমিদার শ্রেণি। সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রজারা জমিদারদের খাজনা পরিশোধ করত জমিতে উৎপন্ন ফসলে। প্রজাদের সব উৎপাদনই ছিল সামন্ত প্রভুর জন্য। মুনতাসীর মামুনের মতে, সামন্তবাদী উৎপাদনের পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হয়। বিস্তারিত উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, মুনতাসীর মামুন, পৃ. (৭৫, ৭৬) অন্যদিকে, সামন্ত শব্দটির ইংরেজি ফিউডাল শব্দের বাংলা ভাষান্তর করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় ছয় শতক থেকে সামন্ত শব্দটি দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে দেখা যায়। এর দ্বারা বোঝাত 'সীমান্তবর্তী রাজা'। ধারণা করা হয়, সীমান্ত শব্দ থেকেই এসেছে সামন্ত শব্দটি। পরবর্তীকালে ভূমির গুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে সামন্তবাদ দ্বারা বোঝাত জমিদার, জায়গিরদার ইত্যাদি। তথ্যসূত্র : বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, পৃ. ১৬১, ১৬২।
৫. জীবনসংগ্রাম, মণি সিংহ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৬।
৬. গারো পাহাড়ের লালফুল, দিলীপ চক্রবর্তী, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৭।
৭. তেভাগা আন্দোলন : বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বৃহৎ আন্দোলন। ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে প্রায় ১৯টি জেলায় আন্দোলনটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। আন্দোলনে কৃষকদের দাবি ছিল–জমির মালিক ও বর্গা কৃষকের উৎপন্ন ফসলকে তিন ভাগে ভাগ করে কৃষক পাবে দুই ভাগ ও মালিক পাবে এক ভাগ।
৮. নিবারণ পণ্ডিত, খগেশ কিরণ তালুকদার, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৩৮।
৯. সংগ্রামের তিন দশক, খোকা রায়, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৬৭।
১০. যে সংগ্রামের শেষ নেই, প্রমথ গুপ্ত, কলকাতা, পৃ. ১১৩।
১১. যে সংগ্রামের শেষ নেই, প্রমথ গুপ্ত, কলকাতা, পৃ. ১১৯।
১২. যে সংগ্রামের শেষ নেই, প্রমথ গুপ্ত, কলকাতা, পৃ. ১২০, ১২১।
১৩. নেত্রকোনা জেলার ইতিহাস, আলী আহাম্মদ খান আইয়োব, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১৫।

১৪. নেত্রকোনার কৃষক আন্দোলন, জালাল উদ্দিন আহমেদ, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫, ৩৬।
১৫. নেত্রকোনা জেলার ইতিহাস, আলী আহাম্মদ খান আইয়োব, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১৬।

১৬. জীবনসংগ্রাম, মণি সিংহ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১১০।
১৭. গারো পাহাড়ের লালফুল, দিলীপ চক্রবর্তী, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৮।
১৮. ভাষা আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার, আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১১০।
১৯. নিবারণ পণ্ডিত, খগেশ কিরণ তালুকদার, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৬৫।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য, যতীন সরকার, ঢাকা, ২০০৯।
২. সমাজতন্ত্রের সহজ পাঠ, শাহীন রহমান, ঢাকা, ২০১০।
৩. আদিবাসী লোকসাহিত্য, ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, ঢাকা, ২০০৮।
৪. জীবনসংগ্রাম, মণি সিংহ, ঢাকা, ১৯৯১।
৫. যে সংগ্রামের শেষ নেই, প্রমথ গুপ্ত, কলকাতা, প্রকাশকাল জানা নেই।
৬. সংগ্রামের তিন দশক, খোকা রায়, কলকাতা, ২০০৮।
৭. আমার জীবনে কমিউনিস্ট পার্টি, মৌলবী আব্দুল হান্নান, ঢাকা, ১৯৯৩।
৮. গারো পাহাড়ের লালফুল, দিলীপ চক্রবর্তী, কলকাতা, ২০০০।
৯. নিবারণ পণ্ডিত, খগেশ কিরণ তালুকদার, ঢাকা, ১৯৯০।
১০. গারো পাহাড়ের আদিবাসী, আলী আহাম্মদ খান আইয়োব, ঢাকা, ২০০৭।
১১. নেত্রকোনা জেলার ইতিহাস, আলী আহাম্মদ খান আইয়োব, ঢাকা, ২০০৭।
১২. আদিবাসী প্রবন্ধ সংকলন, ২০০৭, মতিলাল হাজংয়ের প্রবন্ধ।
১৩. ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ ও কলমাকান্দা, এ ক এম মঞ্জুরুল হক তারা, ঢাকা, ২০১০।
১৪. নেত্রকোনার কৃষক আন্দোলন, জালাল উদ্দিন আহমেদ, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা, ১৯৮৮।
১৫. পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু : দর্শন, যতীন সরকার, ঢাকা, ২০০৫।
১৬. গ্রামের মানুষের সংগ্রামের ঐতিহ্য, অনুরাধা রায়, কলকাতা, ২০০৫।
১৭. মুক্তিসংগ্রামে নেত্রকোনা, গোলাম এরশাদুর রহমান, ঢাকা, ১৯৯৫।
১৮. উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, মুনতাসীর মামুন, ঢাকা, ১৯৯৬।
১৯. বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৯৬।
২০. কমরেড মণি সিংহ স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ২০০৫।
২১. বিপ্লবী রবি নিয়োগী
জ্যোৎস্না নিয়োগী স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ২০০৬।
২২. ময়মনসিংহের চরিতাভিধান, দরজি আবদুল ওয়াহাব, ময়মনসিংহ, ১৯৮৯।
২৩. মোহনগঞ্জের ইতিকথা, জালাল উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা, ২০০৯।
২৪. সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ঢাকা, ১৯৯৮।
২৫. তেভাগার ধূসর স্মৃতি, ডা. অশোক কুমার ভদ্র, রংপুর, ২০০৪।

২৬. সত্য কিরণ আদিত্য স্মারক গ্রন্থ, নেত্রকোনা, ২০০৯।
২৭. প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন, যতীন সরকার, ঢাকা, ২০১০।
২৮। সুসঙ্গ রাজবংশের ইতিহাস, মো. আব্দুস্ ছোবহান তালুকদার, ঢাকা, ২০০০।
২৯। বাংলাদেশের গণসংগীত
বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য, সাইমরানা, ঢাকা, ২০০৯।
৩০। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-৪১), সরোজ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৩।
৩১। মুজিববাদ, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, ঢাকা, ১৯৭২।
৩২। শতাব্দীর দুই দিগন্ত, খালেকদাদ চৌধুরী, ঢাকা, ১৯৯৫।
৩৩। দৈনিক ডেসটিনি, ১৭ এপ্রিল, ২০১২ সংখ্যা।
৩৪। যে দেশে মানুষ বড়, জসীমউদ্‌দীন, ঢাকা, ১৯৯১।
৩৫। ইমান ও নিশান, গৌতম ভদ্র, কলকাতা, ১৯৯৪।
৩৬। ভাষা আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার, আতিউর রহমান,
লেনিন আজাদ, ঢাকা, ১৯৯০।

মাঠ পর্যায়ে যাঁরা আমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন

১. কুমুদিনী হাজং, কৃষককর্মী, টংক আন্দোলন, বহেরাতলী, সুসং দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

২. শাহ্ আব্দুল মোত্তালিব, টংক আন্দোলনের সমসাময়িক কমিউনিস্টকর্মী, বাইরাউড়া, নেত্রকোনা।

৩. স্বপন হাজং, সদস্য, রাশিমণি ম্যামোরিয়াল ট্রাস্ট, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

৪. অমলেন্দু হাজং, আড়াপাড়া, সুসং দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

৫. খোকন হাজং, টংক আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী, লাঙ্গলজোড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

৬. কিরণ হাজং, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

৭. বিনোমণি হাজং, আড়াপাড়া, সুসং দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

৮. মিন্তলা হাজং, আড়াপাড়া, সুসং দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

৯. যাত্রামোহন হাজং, আদর্শ গ্রাম, সুসং দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

১০. গঙ্গাধর হাজং, টংক আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী, চৈতন্যনগর, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

১১. রমাকান্ত হাজং, টংক আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী, রাণীগাঁও, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

১২. দিজেন্দ্র হাজং, সুসং দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

১৩. জহর হাজং, লাঙ্গলজোড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

১৪. সঞ্চিতা হাজং, সুসং দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।

১৫. দেবেন্দ্র হাজং, টংক আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী, লেংগুড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।